বোখারী শরীফ

[বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা]

পঞ্চম খণ্ড

সীরাতুন-নবী সঙ্কলন

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল জামেয়া কোরআনিয়ার
ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা
বর্তমান শায়খুল হাদীছ, জামেয়া রহমানিয়া,
সাত মসজিদ মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক অনূদিত

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ
৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান

প্রথম পৃষ্ঠাগুলির সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠানং
আরবি কাসিদা	৩
উপক্রমণিকা	১১
"মোস্তাফা চরিতের উপক্রমণিকার সমালোচনা	২১
সূচিপত্র	২৩
জ্ঞাতব্য ও সতর্কবাণী	২৭
আরম্ভ	২৮

সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সঃ)-এর দরবারে মানপত্র ও সৌভাগ্য লাভের উসিলা

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ড অনুবাদকালে ১৯৬০ ইং সালে পবিত্র মদীনায় বিশেষভাবে নবীজীর রওজা পাকে পঠিত ঃ

التوسل بمدح خير الرسول

قِفَا نَحْظَ مِنْ ذِكْرٰى حَبِيْبٍ وَّمَنْزِلٍ ـ سَقَتْهُ السَّوَارِىْ وَالْغَوَادِىْ بِسَلْسَلٍ

বন্ধুগণ! অপেক্ষা করুন, আমরা প্রিয়পাত্র ও তাঁহার দেশের আলোচনায় আস্বাদ উপভোগ করি। সকাল-বিকালের মেঘমালাগুলি ঐ দেশকে ঠাণ্ডা রাখুক!

وَمَهْلاً عَلٰى تَذْكَارِ اٰثَارِ طَيْبَةٍ ـ مَدِيْنَةِ مَحْبُوْبٍ كَرِيْمٍ مُفَضَّلٍ

থামুন! "তায়বা" শহরের নিদর্শনগুলির স্মরণে; তাহাই সর্বাধিক মর্যাদাবান বন্ধুর শহর "মদীনা"।

بِهَا قُبَّةٌ خَضْرَاءُ فِىْ رَوْنَقِ الضُّحٰى ـ تَلَئْلَأُ نُوْرًا فَوْقَ بَدْرٍ مُكَمَّلٍ

ঐ শহরে সবুজ গম্বুজ উজ্জ্বলরূপ নিয়া বিদ্যমান আছে, যাহা পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে অধিক দীপ্ত।

بِهَا مَرْقَدُ الْمَوْلٰى الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ ـ يَفُوْقُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُعَلّٰى وَيَعْتَلِىْ

সেই গম্বুজের ভিতরই রহিয়াছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শয্যাস্থান- তাঁহার শয্যার ভূখণ্ডের মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক।

يُذَكِّرُنَا اٰثَارَهَا وَدِيَارُهَا ـ وَتُبْدِىْ لَنَا مَالَانَوَاهُ وَنَجْتَلِىْ

ঐ শহরের ঘরবাড়ী ও নিদর্শনসমূহে এমন বস্তু স্মরণ করায় যাহা আমরা বর্তমান দেখিতেছি না।

نَشُمُّ بِهَا رَيَّا الْحَبِيْبِ كَاَنَّهٗ ـ عَلٰى ظَهْرِهَا ثَاوٍ وَلَمْ يَتَرَحَّلِ

ঐ শহরে এখনও প্রিয়পাত্রের সুবাস এইরূপে ছড়ান রহিয়াছে যে, মনে হয়- তিনি এখনও তাহার ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত- কোথাও যান নাই।

حَبِيْبِ اِلٰهِ الْعٰلَمِيْنَ مُحَمَّدٍ ـ رَفِيْعِ الْعُلٰى خَيْرِ الْبَرَايَا وَاَفْضَلِ

তিনি বিশ্ব জগত প্রভুর প্রিয়পাত্র, সর্বোচ্চ মর্তবার অধিকারী, সৃষ্টির সেরা ও সর্বাধিক মর্যাদাবান।

اِمَامُ النَّبِيِّيْنَ رَسُوْلٌ مُعَظَّمٌ ـ وَسَيِّدُ كَوْنَيْنِ عَدِيْمُ الْمُمَثَّلِ

তিনি সমস্ত নবীর ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, দোজাহানের সর্দার, তাঁহার কোন তুলনা নাই।

شَفَاعَتُهٗ تُرْجٰى لَدٰى كُلِّ عُمَّةٍ ـ وَكَرْبٍ وَّهَوْلٍ وَّاقْتِحَامِ الْغَوَائِلِ

বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত ইত্যাদির সময় সুপারিশের আশার স্থল তিনি।

تَرٰى بِاسْمِهٖ يُشْفَى السَّقَامُ وَاِنَّهٗ ۔ لَحِرْزٌ عَظِيْمٌ مِنْ جَمِيْعِ النَّوَازِلِ

তাঁহার নামের বরকতে অনেক অনেক রোগের উপশম দেখিতে পাইবে এবং তাঁহার নাম সব রকম বিপদ হইতে অতি বড় রক্ষাকবচ।

وَلَوْ كَانَتِ الْاٰيَاتُ تَعْدِلُ قَدْرَهٗ ۔ لَكَانَ اسْمُهٗ يُحْيِيْ رَمِيْمَ الْمَفَاصِلِ

তাঁহার মর্যাদানুপাতিক মোজেযা যদি তাঁহাকে প্রদান করা হইত, তবে তাঁহার নামের বরকতে ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন অঙ্গসমূহ জীবিত হইয়া উঠিত।

هُوَ النُّوْرُ وَالْبُرْهَانُ طٰهٰ وَشَاهِدٌ ۔ وَصَاحِبُ اِسْرَاءٍ عَظِيْمُ الشَّمَائِلِ

পবিত্র কোরআনে নূর (আলো), বোরহান (উজ্জ্বল প্রমাণ), শাহেদ (সাক্ষী) এবং 'তোয়া-হা' বলিয়া তাঁহাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি সপ্ত আকাশ ভ্রমণকারী এবং সর্বোচ্চ গুণাবলীর আকর।

دَعَاهُ الْاِلٰهُ بِالْبُرَاقِ وَمِعْرَاجٍ ۔ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَاَعْلَى الْمَنَازِلِ

স্বয়ং আল্লাহ বোরাক এবং উড়ন্ত সিংহাসন পাঠাইয়া ঊর্ধ্বস্থানীয় জগতের এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের প্রতি তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া নিয়াছিলেন।

فَسَارَ اِلَى الْعَرْشِ وَمَا شَاءَ رَبُّهٗ ۔ لِرُؤْيَةِ اٰيَاتٍ عِظَامِ الدَّلَائِلِ

সেমতে তিনি পরিভ্রমণ করিলেন মহান আরশ পর্যন্ত এবং যে পর্যন্ত পরওয়ারদেগারের ইচ্ছা হইয়াছিল, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এবং তাঁহার প্রভুত্বের বড় বড় প্রমাণ পরিদর্শন করিবার জন্য।

وَزَارَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَالَمْ يُفَسَّرْ ۔ وَحَازَ الْكَرَامَاتِ وَمَا لَمْ يُفَصَّلْ

এবং তিনি পরিদর্শন করিলেন এমন এমন মহান নিদর্শনসমূহ, যাহা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব এবং তিনি এমন এমন সম্মান লাভ করিলেন যাহা বর্ণনাতীত

وَنَالَ الْعُلٰى فَوْقَ الْخِيَالِ وَخَاطِرٍ ۔ وَعِزًّا وَّاِجْلَالًا وَّكُلَّ الْفَضَائِلِ

এবং উচ্চ মর্তবা, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত এই পর্যায়ের লাভ করিলেন যাহা ভাবনা বা ধারণায়ও আসিতে পারে না।

دَنَا فَتَدَلّٰى قَابَ قَوْسَيْنِ رَبُّهٗ ۔ فَاَوْحٰى اِلَيْهِ مِنْ عِظَامِ الْمَسَائِلِ

তিনি প্রভুর নৈকট্য লাভ করিলেন যতদূর সৃষ্ট ও সৃষ্টার মধ্যে সম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, অতপর বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বহু সার্কুলার তাঁহাকে প্রদান করিলেন

وَصَارَ نَجِيًّا لِلْحَبِيْبِ حَبِيْبُهٗ ۔ وَجِبْرِيْلُ نَاءٍ فِى الْوَرَاءِ بِمَعْزِلٍ

এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ হইল, তখন জিব্রাঈল পর্যন্ত তথা হইতে বহু পিছনে ছিলেন।

هَدَانَا اِلَى الْخَيْرِ وَجَنَّةِ رَبِّنَا ۔ اَتَانَا مِنَ اللّٰهِ بِدِيْنٍ مُعَدَّلٍ

তিনি আমাদিগকে উন্নতি ও বেহেশতের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে পারিপাট্য-বিশিষ্ট দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।

لَقَدْ جَاءَ وَالنَّاسُ فِيْ قَعْرِ ظُلْمَةٍ ـ ضَلَالٍ وَّاشْرَاكٍ وَفِيْ كُلِّ بَاطِلِ

তাঁহার আবির্ভাব হইল যখন মানুষ ভ্রষ্টতা, শেরক ও সব রকম কুসংস্কারে নিমজ্জমান ছিল।

بَشِيْرًا نَذِيْرًا لِلْاَنَامِ وَرَحْمَةً ـ رَؤُوْفًا رَحِيْمًا مِثْلَ عَذْبِ الْمَنَاهِلِ

তিনি সুসংবাদবাহক ও সতর্কবাণীবাহক হইয়া আসিলেন বিশ্ব মানবের জন্য এবং রহমত, মেহেরবান, দয়ালু ও পিপাসা নিবারক সুমিষ্ট ঝর্ণারূপী হইয়া আসিলেন।

سِرَاجًا مُنِيْرًا مِثْلَ شَمْسِ ظَهِيْرَةٍ ـ كَرِيْمًا جَوَادًا مِثْلَ غَيْثٍ مُحَفَّلِ

দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায় দীপ্ত প্রদীপ হইয়া আসিলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালার ন্যায় দাতা হইয়া আসিলেন।

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ مَحَبَّةً ـ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ لَنْ تَرَوْ مِنْ مُمَاثِلِ

বিশ্ব মানবের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ যে, তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক বস্তু তিনি একেবারেই বরদাশত করেন নাই এবং তাহাদের জন্য এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যাহার কোন তুলনা নাই।

وَدَاعٍ اِلَى الْخَيْرِ بِوَعْظٍ وَّحِكْمَةٍ ـ وَهَادٍ اِلَى اللّٰهِ بِقَوْلٍ مُدَلَّلِ

নসীহত ও হেকমতের দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীকে মঙ্গলের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইয়াছিলেন এবং দলীল প্রমাণ মারফত আল্লাহর প্রতি পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন।

وَبِالْبَيِّنَاتِ مِنْ دَلَائِلِ رَبِّهٖ ـ وَبِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ الْجَلَائِلِ

এবং স্বীয় প্রভুর পক্ষ হইতে প্রদত্ত উজ্জ্বল প্রমাণ, প্রকাশ্য বড় বড় অলৌকিক ঘটনা মারফত–

تَشَقَّقَ بَدْرٌ مِنْ اِشَارَةِ اِصْبَعٍ ـ تَكَسَّرَ صَخْرٌ مِنْ اِشَارَةِ مِعْوَلِ

তাঁহার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল এবং গেতীর ইশারায় বিরাট পাথর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

وَسَلَّمَ اَحْجَارٌ عَلَيْهِ تَحِيَّةً ـ عَلَيْكَ سَلَامُ اللّٰهِ دَوْمًا تَقَبَّلِ

পাথরসমূহ তাঁহাকে সালাম করিয়াছিল যে, আপনার প্রতি সর্বদা আল্লাহর তরফ হইতে শান্তি বর্ষিত হউক– এই সালাম কবুল করুন।

وَجَاءَ عِدَاهُ بِالْحِجَارَةِ قُبْضَةً ـ فَنَادَتْ نِدَاءً فِيْ شَهَادَةِ مُرْسَلِ

শত্রুদল কাঁকর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উপস্থিত হইল, ঐ কাঁকর উচ্চ স্বরে তাঁহার রেসালতের সাক্ষ্য দিল।

تَفَلَّتَ اَشْجَارٌ اِلَيْهِ مُلَبَّةً ـ وَقَامَتْ لَدَيْهِ مِثْلَ عَبْدٍ مُذَلَّلِ

তাঁহার আদেশ পালনে কতিপয় বৃক্ষ ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে অনুগত দাসের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল

تَجْمَعُ اَغْصَانٌ اِلَيْهِ مُظِلَّةً ـ وَسَارَ الْغَمَامُ مِثْلَ سَقْفٍ مُظَلِّلِ

গাছের ডালা তাঁহাকে ছায়া দানের জন্য একত্রিত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল এবং মেঘমালা ছায়া প্রদানকারী ছাদের ন্যায় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল।

وَحَنَّتْ اِلَيْهِ نَخْلَةٌ مِنْ مُحَبَّةٍ ـ فَاَنَّتْ وَرَنَّتْ كَالْيَتِيْمِ وَاَرْمَلِ

এবং তাঁহার বিচ্ছেদে কাষ্ঠ বিচ্ছেদ-যাতনা প্রকাশ করিয়া এতীম ও বিধবার ন্যায় কাঁদিয়াছিল।

فَلَمَّا اَتَاهَا هَادِءً مُتَعَطِّفًا ـ لَغَاضَ بُكَاهَا كَالْوَلِيْدِ الْمُعَلَّلِ

অতপর যখন তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিলেন এবং স্নেহ দেখাইলেন, তখন সান্ত্বনা প্রদত্ত শিশুর ন্যায় তাঁহার ক্রন্দন ক্ষান্ত হইয়া গেল।

تَشَكَّتْ اِلَيْهِ بِالْمَظَالِمِ نَاقَةٌ ـ وَكَلَّمَ ظَبْيٌ مِثْلَ ثَكْلٰى بِمَامَلِ

উষ্ট্রী আসিয়া তাহার উপর অত্যাচারের অভিযোগ তাঁহাকে জানাইয়াছিল এবং হরিণ তাঁহার নিকট সন্তানহারা মায়ের ন্যায় স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিল।

اَتَتْ عَنْكَبُوْتٌ بِالْبُيُوْتِ وِقَايَةً ـ عَلَيْهِ مِنَ الْاَعْدَاءِ تَحْمِيْ بِمَقْتَلِ

মাকড়সা ঘর বানাইয়া তাঁহাকে শত্রু হইতে হেফাযত করিয়াছিল যখন তাঁহার প্রাণের ভয় ছিল।

وَجَائَتْ تَقِيْهِ مِنْ عَدُوٍّ حَمَامَةٌ ـ يَقُوْلُ لِشَانٍ لَاتَخَفْ وَتَوَكَّلِ

এবং শত্রু হইতে রক্ষা করার জন্য কবুতরও আসিয়াছিল– তিনি নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, ভয় পাইও না– আল্লাহর উপর ভরসা কর।

وَقَدْ قَالَ يَا اَرْضُ خُذِيْهِ لِفَارِسٍ ـ فَلَمْ يَتَخَلَّصْ قَبْلَ اَمْرٍ مُبَدِّلِ

একবার এক অশ্বারোহী শত্রুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মাটি! এই ব্যক্তিকে পাকড়াও কর, অতপর সে আর ছুটিয়া যাইতে পারিল না, যাবত না তিনি ছাড়িবার নির্দেশ দিলেন।

طُيُوْرٌ وَوَحْشٌ وَالْخَلَائِقُ كُلُّهَا ـ لَتَدْرِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ دُوْنَ التَّنَامُلِ

পশুপক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্ট জগত আল্লাহর রসূলকে বিনা দ্বিধায় চিনিয়া থাকিত।

دَعَا قَوْمَهٗ يَوْمًا اِلَى اللّٰهِ دَعْوَةً ـ وَاَنْذَرَهُمْ هَوْلَ الْعَذَابِ الْمُعَجَّلِ

একদা তিনি স্বীয় জাতিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী আযাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করিলেন।

فَنَادٰى نِدَاءً يَا مَعَاشِرَ مَكَّةَ ـ هَلُمُّوْا اِلٰى قَوْلِ النَّذِيْرِ الْمُهَوِّلِ

সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে মক্কার বিভিন্ন গোত্র! তোমরা ভয়ঙ্কর সংবাদদাতা সতর্ককারীর কথার প্রতি ধাবিত হও।

فَعَمَّ قُرَيْشًا وَالْعَشِيْرَةَ كُلَّهَا ـ وَخَصَّ مِنَ الْقُرْبٰى بِقَوْلٍ مُفَصَّلِ

তিনি কোরায়েশ তথা স্বীয় বংশধরের সকলকে এবং বিশেষভাবে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন–

اَلَا تَعْلَمُوْنِيْ صَادِقًا اِنْ اَخَفْتُكُمْ ـ بِجَيْشٍ اَتَاكُمْ عَنْ قَرِيْبٍ مُعَجِّلِ

"আমি যদি এইরূপে সতর্ক করি যে, অতি সত্বর নিকটবর্তী স্থান হইতে এক দল শত্রু সেনা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে– তবে কি আমাকে সত্যবাদী গণ্য করিবে"?

فَقَالُوْا بُلٰى لَمْ تَاْتِ زُوْرًا وَلَمْ نَرْ ۔ بِكَ الْكِذْبَ يَاخَيْرَ الْاَمِيْنِ الْمُعَوَّلِ

তাহারা সকলে এক বাক্যে বলিল, নিশ্চয়– কারণ আপনি কখনও মিথ্যা অবলম্বন করেন নাই এবং হে নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী! আপনার মধ্যে কখনও আমরা মিথ্যা পাই নাই।

فَقَالَ اسْمَعُوْا ثُمَّ اسْمَعُوْنِىْ فَاِنَّنِىْ ۔ نَذِيْرٌ لَّكُمْ قَبْلَ الْعَذَابِ الْمُخَجِّلِ

তখন তিনি বলিলেন, তোমরা শুন, পুনঃ বলিতেছি– তোমরা কথা শুন, অপদস্থকারী আযাব আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।

اَلَا فَاعْبُدُوْا رَبًّا وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ ۔ وَلَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ اِلٰهٍ مُسَوَّلِ

তোমরা সতর্ক হও– সৃষ্টিকর্তার এবাদত কর এবং তাঁহার সঙ্গে শরীক করিও না গর্হিত মাবুদের এবাদত করিও না।

اَلَا فَاهْجُرُوْا رِجْزًا وَاَوْثَانَ قَوْمِكُمْ ۔ وَمَا يَعْبُدُ الْاٰبَاءُ اَجْلَ الْمَجَاهِلِ

তোমরা মূর্তি ও গোত্রীয় দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ কর এবং তোমাদের বাপ-দাদা অজ্ঞতার দরুন যাহাদের পূজা করিত ঐসবও পরিত্যাগ কর।

فَرَاغُوْا اِلَيْهِ بِالْعَدَاوَةِ كُلُّهُمْ ۔ وَهَمُّوْا بِهٖ شَرًّا بِكُلِّ الْوَسَائِلِ

তখন তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি শত্রুতার ব্যবহার আরম্ভ করিল এবং সব রকমের ব্যবস্থাবলম্বন করিয়া তাঁহার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হইল।

سَعٰى كُلَّ سَعْيٍ فِىْ هِدَايَةِ قَوْمِهٖ ۔ وَلٰكِنْ تَلَقَّوْهُ بِشَرٍّ مُسَلْسَلِ

তিনি স্বীয় জাতিকে হেদায়াত করার জন্য সব রকমের চেষ্টাই করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহারই করিতে লাগিল।

فَصَارَ يَجُوْلُ فِى الْمَجَامِعِ تَارَةً ۔ وَطَوْرًا يَدُوْرُ فِىْ بُطُوْنِ الْقَبَائِلِ

তখন তিনি বিভিন্ন লোক সমাগমের স্থানে বিভিন্ন গোত্রের শাখাসমূহের নিকট সত্যের ডাক নিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন

وَيَعْرِضُ دِيْنَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ مَحْضَرٍ ۔ وَيَدْعُوْا عِبَادَ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ مَحْفِلِ

এবং তিনি প্রত্যেক সুযোগেই আল্লাহর দ্বীনকে লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সভা-সমিতিতে তিনি আল্লাহর বান্দাগণকে আহ্বান জানাইতে লাগিলেন।

اَتَا طَائِفًا يَدْعُوْ اِلٰى دِيْنِ رَبِّهٖ ۔ وَيَرْجُوْ بِاَهْلِيْهَا لِعَوْنٍ مُؤَمَّلِ

এই পরিস্থিতিতে তিনি তায়েফ নগরে স্বীয় পরওয়ারদেগারের দ্বীনের আহ্বান নিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি তায়েফবাসী হইতে আশানুরূপ সাড়া পাইবার ভরসা করিতেছিলেন

وَلٰكِنْ اَتَوْهُ بِالْجَفَاءِ وَغَدْرَةٍ ۔ وَجَوْرٍ وَّاِيْلَامٍ وَجُرْحٍ مُقَتِّلِ

কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অসদ্ব্যবহার, অত্যাচার, দুঃখ-যাতনা প্রদান এবং প্রাণনাশক আঘাত লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল

وَاَدْمَوْهُ ضَرْبًا بِالْحِجَارَةِ صِبْغَةً ـ وَاَذَوْهُ اِيْذَاءً بِمَا لَمْ يُمَثَّلِ

এবং তাহারা পাথর মারিয়া তাঁহাকে রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিল এবং দৃষ্টান্তহীন কষ্ট-যাতনা দিল।

فَسَالَتْ دِمَاءٌ مِّنْ جَبِيْنٍ مُّبَارَكٍ ـ وَصَارَتْ عَلَى الرِّجْلِ كَخُفٍّ مُنَعَّلِ

তাঁহার মোবারক মুখ-মণ্ডলের রক্ত বহিয়া পায়ের উপর মোজা ও জুতার ন্যায় হইয়া গেল।

لِيَمْسَحُ وَجْهًا مِّنْ دِمَاءٍ وَمَدْمَعٍ ـ وَيَمْشِىْ غَشِيًّا فِىْ هُجُوْمِ الْبَلَابِلِ

তিনি মুখমণ্ডলের রক্ত ও অশ্রু মুছিতে লাগিলেন এবং দিশাহারা হইয়া বিপদের তুফানের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

فَجَاءَ اِلَيْهِ مِنْ مَلَائِكِ رَبِّهٖ ـ لِاِهْلَاكِ قَوْمٍ بِالْعَذَابِ الْمُنَكِّلِ

এমতাবস্থায় তাঁহার প্রভুর ফেরেশতা আসিল ঐ দেশবাসীকে আযাব দানে ধ্বংস করার জন্য।

لِاِهْلَاكِهِمْ بَيْنَ الْجِبَالِ بِطَائِفٍ ـ بِسَحْقٍ وَّرَضٍّ بَيْنَهَا مِثْلَ فِلْفِلِ

তায়েফ নগরীর পাহাড়সমূহের মধ্যে মরিচের ন্যায় পিষিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য।

وَلَكِنْ دَعَا رَبِّىْ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ ـ اِذَا يَعْرِفُوْنِىْ لَنْ يُّصِيْبُوْا بِخَرْدَلِ

কিন্তু তিনি তাহাদের ধ্বংস চাহিলেন না বরং দোয়া করিলেন, হে প্রভু! এই জাতিকে হেদায়াত দান করুন। তাহারা চিনিতে পারিলে আমাকে সরিষার দানার আঘাতও করিবে না।

وَاِنْ كَانَ اُوْلٰى كَذَّبُوْنِىْ فَنَسْلُهُمْ ـ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَا مُؤْمِنِيْنَ فَاجْمِلِ

তিনি আরও বলিলেন– তাহারা যদিও আমাকে অমান্য করিতেছে; কিন্তু আশা করি তাহাদের বংশের মধ্যে ঈমানদার সৃষ্টি হইবে, অতএব তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন।

فَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَاْتِىْ بِشَفْقَةٍ ـ عَلٰى مَنْ يَّجُوْرُ مِنْ عَدُوٍّ وَّقَاتِلِ

এই ছিলেন আল্লাহর রসূল– প্রাণঘাতী শত্রু অত্যাচারীর প্রতিও তিনি দয়া প্রদর্শন করিতেন।

وَيَدْعُوْلَهُمْ بِالْخَيْرِ حَبًّا وَّرَحْمَةً ـ يَسْكُنُ غَضَبَ اللّٰهِ حِيْنَ التَّنَزُّلِ

এবং তাহাদের প্রতিও দয়াপরবশ হইয়া মঙ্গল কামনা করিয়া দোয়া করিতেন– আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার মুহূর্তে তাহাকে ঠান্ডা করিয়া দিতেন।

مُعِيْنٌ لِّخَلْقِ اللّٰهِ فِىْ كُلِّ غُمَّةٍ ـ شَفِيْعُ الْعُصَاةِ فِىْ شَدِيْدِ الْمَاْزِلِ

প্রত্যেক কষ্ট-যাতনার স্থানেই তিনি আল্লাহর বান্দাদিগকে সাহায্যকারী এবং ভীষণ কঠিন স্থানে গোনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী।

وَسَاقِىْ عِطَاشِ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ مَحْشَرٍ ـ مِنَ الْحَوْضِ اَحْلٰى مِنْ حَلِيْبٍ مُّعَسَّلِ

হাশরের দিন তিনি তৃষ্ণাতুর মানুষকে এমন হাউজ হইতে পান করাইবেন যাহার পানীয় দুগ্ধ ও মধু অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু।

شَرَابًا طَهُوْرًا مَنْ يُّصِبْ مِنْهُ جُرْعَةً ـ يَجِدْ رِيَّةً تَبْقٰى وَلَمْ تَتَزَيَّلِ

এমন পবিত্র শরবত যেব্যক্তি এক ঢোক লাভ করিবে সে চিরজীবনের জন্য তৃপ্তি লাভ করিবে।

يَجِيْئُ اِلَى الْعَرْشِ وَيَسْجُدُ رَبَّهٗ ـ اِذَا النَّاسُ سَكْرٰى فِيْ شَدِيْدِ التَّمَلْمُلِ

যখন (কিয়ামতের মাঠে) মানুষ ভীষণ চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পতিত হইবে, তখন তিনি আরশের নীচে আসিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে সেজদা করিতে থাকিবেন

اِذَا النَّاسُ سَكْرٰى مِنْ شَدَائِدِ مَحْشَرٍ ـ حَيَارٰى كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ بِمَوْجَلِ

যখন মানুষ হাশরের মাঠের বিপদের ভয়ে পতঙ্গ দলের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ছুটাছুটি করিতে থাকিবে

يَفِرُّ قَرِيْبٌ مِنْ قَرِيْبٍ وَّاَقْرَبٍ ـ بِيَوْمِ حِسَابٍ لَمْ تَجِدْ مَنْ يُّعَوَّلِ

হিসাবের দিন সর্বাধিক নিকটস্থ আত্মীয় পরস্পর একে অন্য হইতে পলাইয়া যাইবে, কাহাকেও ভরসাস্থলরূপে পাওয়া যাইবে না

وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَبْكِيْ لِاُمَّةٍ ـ وَيَدْعُوْا لِاِلٰهٖ بِابْتِهَالِ التَّذَلُّلِ

কিন্তু রসূল (সঃ) উম্মতের জন্য কাঁদিবেন ও কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহর দরবারে দোয়া করিবেন।

اِلٰهِيْ تَرَحَّمْ وَاغْفِرَنْ كُلَّ اُمَّتِيْ ـ وَادْخِلْهُمُ الْجَنَّاتِ فِيْ خَيْرِ مَنْزِلِ

হে আল্লাহ! আমার প্রত্যেক উম্মতকে ক্ষমা কর, রহমত কর, তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল কর।

ثِمَالٌ مَلَاذٌ فِيْ ثَلٰثِ مَوَاطِنٍ ـ صِرَاطٍ وَّمِيْزَانٍ وَنَشْرِ الرَّسَائِلِ

তিনি বিশেষরূপে তিনটি জায়গায় আশ্রয়স্থল– পুলসেরাতে, নেকী-বদী ওজনের পাল্লার স্থানে এবং আমলনামা বণ্টনের স্থানে।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيْبُ الْمُكَرَّمُ ـ تَحِيَّةُ مُشْتَاقُ اِلَيْكَ وَاٰمِلِ

আপনার প্রতি সালাম হে (আল্লাহর) সম্মানী হাবীব! ইহা আপনার দ্বারে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষাধারীর সম্ভাষণ।

اَتَيْتُ بِاٰمَالٍ وَّشَوْقٍ وَرَغْبَةٍ ـ رَجَاءٍ اِلَيْكُمْ وَابْتِغَاءَ التَّوَسُّلِ

আশা ও আগ্রহ নিয়া আমি আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি– আপনার উসিলা লাভের উদ্দেশে।

فَرَبُّكَ سَاعٍ فِيْ رِضَاكَ وَمُسْرِعٌ ـ وَيَعْطِيْكَ مَا تَرْضٰى بِدُوْنِ التَّمَثُّلِ

আপনার পরওয়ারদেগার আপনার সন্তুষ্টি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং যথাসত্বর আপনার সন্তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন।

وَاَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ جِئْتُكَ تَائِبًا ـ وَمُسْتَغْفِرًا رَبِّيْ لِذَنْبِيْ الْمُذَلِّلِ

আপনি আল্লাহর রসূল, আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট তওবা করত এবং আমার অপদস্থকারী গোনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করত আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি।

فَلَوْ اَنَّكَ اسْتَغْفَرْتَهٗ لِىْ وَجَدْتُهٗ ـ رَحِيْمًا وَّتَوَّابًا فَهَلْ اَنْتَ مُجْمِلِىْ

আপনি যদি আমায় মাগফেরাতের দোয়া করেন তবে নিশ্চয় আমি পরওয়ারদেগারকে তওবা গ্রহণকারী মেহেরবানরূপে পাইব, আপনি কি সহানুভূতি করিবেন?

وَهٰذَا لَوَعْدٌ يَارَسُوْلَ مُحَقَّقٌ ـ بَوَحْىٍ اِلَيْكَ مِثْلُهٗ لَمْ يُبَدَّلِ

হে আল্লাহর রসূল! উক্ত বিষয়টি আল্লাহ তাআলার অকাট্য ওয়াদা, যাহা আপনার প্রতি ওহী দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে– তাহার বরখেলাপ হইবে না।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَاشَفِيْعُ الْمُشَفَّعُ ـ شَفَاعَتُكَ الْعُظْمٰى نَجَاةٌ لِنَائِلِ

আপনার প্রতি সালাম হে গ্রহণীয় সুপারিশকারী। আপনার মহান শাফাআত যে লাভ করিবে তাহার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَارَؤُفُ وَمُشْفِقٌ ـ ثِمَالٌ مَلَاذٌ لِلْحَيَارٰى وَعُوْلِ

আপনার প্রতি সালাম হে মেহেরবান স্নেহশীল। আপনি বিপদগ্রস্ত আতঙ্কগ্রস্তের আস্থার স্থল।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَارَسُوْلَ الْمُعَظَّمُ ـ جَزَاكَ الْاِلٰهُ بِالْمَزِيْدِ وَاَكْمَلِ

আপনার প্রতি সালাম হে শ্রেষ্ঠ রসূল। আল্লাহ আপনাকে অধিক অধিক প্রতিদান দান করুন।

شَهَادَتُنَا اَنْ قَدْ هَدَيْتَ جَمِيْعَنَا ـ وَبَلَّغْتَ مَا اُوْتِيْتَ مِنْ كُلِّ مُنْزَلِ

আমরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছি– আপনি আমাদের সৎপথ দেখাইয়াছেন এবং যাহা কিছু আল্লাহর তরফ হইতে লাভ করিয়াছেন সব আপনি আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

وَاَدَّيْتَ وَاللّٰهِ اَمَانَةَ رِبِّنَا ـ فَصِرْنَا عَلٰى دِيْنٍ مُتِيْنٍ مُسَهَّلِ

খোদার কসম– আপনি পরওয়ারদেগারের সমস্ত আমানত পূর্ণরূপে আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, তাই আমরা একটি সহজ ও মজবুত দ্বীনের সন্ধান পাইয়াছি।

اَتَيْتُكَ يَا خَيْرَ الْمَلَاذِ زِيَارَةً ـ وَمُسْتَشْفَعًا كَالْعَائِذِ الْمُتَوَسِّلِ

হে সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়ের স্থান! উসিলা ও আশ্রয়ের আশা নিয়া সুপারিশ প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে হাযির হইয়াছি।

تَرَحَّمْ عَزِيْزَ الْحَقِّ يَابَحْرَ رَحْمَةٍ ـ وَيَا مَرْجِعَ الْعَاصِىْ وَيَا خَيْرَ مَوْئِلِ

হে দয়ার দরিয়া– হে গোনাহগারের উপস্থিতির স্থল, হে সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল! আপনি আমি "আজিজুল হকের" প্রতি দয়া করুন।

عَلَيْكَ اُلُوْفٌ مِّنْ صَلٰوةٍ وَرَحْمَةٍ ـ وَاٰلَافُ تَسْلِيْمٍ مِنَ الْعَبْدِ فَاقْبَلِ

আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরূদও আল্লাহর রহমত এবং লক্ষ লক্ষ সালাম এই গোলামের পক্ষ হইতে কবুল করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপক্রমণিকা

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মানবরূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি রসূল ছিলেন; এমন রসূল যে, বিশ্ব বুকে আল্লাহ প্রেরিত এক লক্ষ বা দুই লক্ষের অধিক সংখ্যক রসূলের সেরা ও সর্দার বা সর্ব ঊর্ধ্বের রসূল ছিলেন তিনি।

নবী-রসূলগণ মানব জাতির মধ্যে সর্ব ঊর্ধ্বের এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব ঊর্ধ্বের হইলেন নবীজী (সঃ)। এই ঊর্ধ্বের সীমা কি তাহা একমাত্র আল্লাহ তাআলাহ জানেন।

তবে হিন্দুদের ন্যায় দেবত্ববাদ তথা গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও পূজনীয় গণ্য করা– ইসলামে ইহার স্থান নাই। উপাসনা এক আল্লাহ তাআলার জন্যই সীমাবদ্ধ– এই অতি ঊর্ধ্বের মর্যাদা অন্য কাহারও নাই। তাই হযরত (সঃ) সম্পর্কে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানগণ এই পরিচয় উল্লেখ করেন, عبده ورسوله আবদুহু ওয়া রসূলুহু "আল্লাহর বান্দা– উপাসক; দাস এবং আল্লাহর রসূল"।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উপাস্য ও পূজনীয় হওয়া অর্থে অতিমানুষ বা অলৌকিক ব্যক্তি নিশ্চয় ছিলেন না; কিন্তু সকল সৃষ্টির সর্ব ঊর্ধ্বের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় তাঁহার ছিল এবং তাঁহার এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন ও প্রকাশরূপে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার জন্য অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ সাধন করিয়াছেন। এই সূত্রে তাঁহাকে মহামানুষ, এই অর্থেই তাঁহাকে অতি মানুষ বলিলে তাহা শুধু ভাষার প্রয়োগ হইবে। ভাষা হিসাবে মহামানুষ ও অতিমানুষ এই দুইয়ের মধ্যে এত বড় বিরাট ব্যবধান আছে কিনা যে, অতিমানুষ শব্দ দেবত্বের মতবাদ বুঝায়– তাহা পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিতে পারেন। জনসাধারণের আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা চাই যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মর্যাদা ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্বে ছিল। কিন্তু উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার মর্যাদা তাঁহার ছিল না মোটেই। সেইরূপ ধারণা থাকিলে তাহা অবশ্যই শেরক অংশীবাদ গণ্য হইবে। ইহার মর্ম এই আয়াতের انما انا بشر مثلكم "আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ বৈ নহি।" অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা তথা উপাসক দাস– উপাস্য, পূজনীয় মোটেই নহি।

এই আয়াতের সূত্র ধরিয়া নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অতিমানুষ হওয়াকে অস্বীকার করার আড়ালে একটি ইসলাম বিরোধী মতের ফাঁক বাহির করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর লোক নবী-রসূলগণের মোজেযা, যাহা অলৌকিক ঘটনাবলী হইয়া থাকে, তাহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। ঐ শ্রেণীর লোকেরাই এই জিগির তোলায় খুব উৎসাহী যে, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অতিমানুষ বা অলৌকিক মানুষ ছিলেন না। এই জিগিরের সঙ্গে ইহা মিশাইয়া দেওয়া তাহাদের জন্য জন্য সহজ হয় যে, তিনি যেহেতু অলৌকিক মানুষ ছিলেন না, তাই তাঁহার কোন ঘটনা বা কার্যও অলৌকিক হইবে না। এই ভাব প্রবণতায় তাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লারে মোজেযার অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বাভাবিকের গণ্ডিভুক্ত করিতে অস্বাভাবিক হেরফের ও গোঁজামিলের পিছনে ছুটা ছুটি করে। শুধু নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা সম্পর্কেই নহে, নবীগণের সকলের মোজেযার ব্যাপারে, তাহাদের এই হাল। যেমন স্বভাবের ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ মরহুম। নবীর মোজেযা সম্পর্কে উল্লিখিত প্রবণতাটা খাঁ মরহুমের বাতিক ব্যাধিরূপ ছিল। পবিত্র কোরআনের পূর্ববর্তী বিভিন্ন নবীগণের মোজেযা শ্রেণীর যেসব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার তফসীর নামীয় কোরআনের অপব্যাখ্যায় তিনি ঐসবের বিকৃতি সাধনে যেসব অস্বাভাবিক

হেরফের ও গোঁজামিলের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখজনক। তাঁহার জীবদ্দশায় আমরা ঐসবের কঠোর সমালোচনায় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহার বিভিন্ন অংশ বাংলা বোখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ডের বিভিন্ন পাদটীকায় বিদ্যমান আছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযাসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরহুম ঐ পথই অবলম্বন করিয়াছেন। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিখ্যাত বিখ্যাত মোজেযা, যেমন– মে'রাজ, বক্ষবিদারণ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা এবং নবীজীর হিজরত সফরের বিভিন্ন মোজেযার ঘটনা ইত্যাদিকে হয় অস্বীকার করিয়াছেন, না হয় আজগবীরূপে বিকৃত করিয়াছেন। বিশেষত নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সম্মান প্রদর্শনে এবং নবুয়তের আভাস দানে যেসব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়াছিল সেসবের সহিতও তিনি ঐ ব্যবহারই করিয়াছেন। তাঁহার অপচেষ্টার কোন কোনটার সমালোচনা বিভিন্ন পাদটীকায় আমরা করিব।

খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপচেষ্টার পথ পরিষ্কারে স্থায়ী ব্যবস্থারূপে তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যয় করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দুইটি জঘন্য বিষ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। একটি হইল– মুসলিম জাতির গৌরব, ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুরক্ষক, অতন্দ্রপ্রহরী কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ পূর্ববর্তী মহান ইমামগণকে শুধু উপেক্ষা ও কটাক্ষ করাই নহে বরং তাঁহাদিগকে সমাজের নিকট পরিতাজ্য সাব্যস্ত করিার জন্য অশালীন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি হইল, ঐ মনীষী ইমানমগণের জীবন সাধনালব্ধ মূল্যবান জ্ঞান-গবেষণার প্রতিও সমাজের আস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই অপকর্ম অপচেষ্টায় খাঁ মরহুমের মতলব সিদ্ধি হইবে বটে, কারণ মোজেযার অনেক ঘটনা অস্বীকার করিতে বা বিকৃত করিতে বিরাট বাধা প্রতিবন্ধক সম্মুখে এই আসে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সঙ্কলনে পূর্বাপর সাধক গবেষকগণ সকলে একবাক্যে ঐসব ঘটনাবলীর স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং তাহা গুরুত্বসহকারে লিখিয়াছেন। অতপর শত শত বৎসর হইতে তাঁহাদের সঙ্কলন মুসলিম সমাজে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ঐ সব সঙ্কলনে প্রতি আস্থা বিনষ্ট করিতে পারিলে সহজেই ঐ বাধা অপসারিত হইল; কিন্তু ইহার পরিণাম অতি মারাত্মক। জাতীয় সাধক গবেষকগণ এবং তাঁহাদের সঙ্কলন জ্ঞানভান্ডার জাতির অমূল্য ধন; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে জাতি রিক্তহস্ত এবং এতীম হইয়া পড়িবে।

সভ্য ও প্রগতিশীল জগতের অবস্থা লক্ষ্য করুন। হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণের রায়সমূহ সরকারীভাবে গেজেটরূপে প্রকাশিত এবং বিশেষ যত্নের সহিত সুরক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের বিচারপতিগণ পরস্পর ঐসব রায়ের পূর্ণ মর্যাদা দিয়া থাকেন। উকিল-মোক্তারগণ ঐসব রায়ের বরাত বা রেফারেন্স দানের ক্ষেত্রে কেহই তাহাকে উপেক্ষা করেন না।

খাঁ মরহুম ঐ বিষাক্ত বস্তুদ্বয়কে তাঁহার পাণ্ডিত্যের রং-পলিশ এবং ভাষার লালিত্যের সাজ-সজ্জায় এত সুন্দর রূপ দিয়াছেন যে, বুঝমান মানুষও তাহা বরণ করিতে দ্বিধা করিবে না। পাণ্ডিত্যে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ও প্রতিভাবান এবং প্রকাশ ভঙ্গির ছল-চাতুরীতে তাঁহার ন্যায় পটু কোন মানুষ তাঁহার মোকাবিলায় আসিলে তিনি যেভাবে অসত্যকে সুন্দর সাজে সত্যবেশী বানাইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার বিপক্ষ অন্ততঃ সত্যকে সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। আমরা শুধু সংক্ষেপে খাঁ মরহুমের মাকালরূপী কোন কোন বক্তব্যের সামান্য ইঙ্গিত এবং তাহা খণ্ডনে আলোচনা প্রদানের চেষ্টা করিব।

খাঁ মরহুম প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্ববর্তী সীরাত সঙ্কলনসমূহের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন– "মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় প্রায়ই দেখা যায় যে, কিংবদন্তী-সঙ্কলক, ঐতিহাসিক ও অন্ধ ভক্তগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী পর্বত পরিমাণ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জনা রাশির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ ও খৃস্টানদের যীশু খৃস্টের নাম উল্লেখ করা যায়। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্বন্ধেও অবস্থা কতেকটা ঐরূপ। (নাউযু বিল্লাহ)

কী জঘন্য দৃষ্টান্ত ও মহাপাপের উক্তি! হিন্দুদের এবং শ্রীকৃষ্ণের তুলনার ন্যায় ঈমানহীনতার বেআদবী ত দূরের কথা– হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত হওয়ার দাবীদার খৃষ্টানদের উল্লেখও এই ক্ষেত্রে রাত্র ও দিনের ন্যায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খাতিরে আল্লাহ তাআলা একটি বিশেষ নিশ্চয়তা দিয়া দিয়াছেন– নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মত সত্যের বিপরীতের উপর একমত হইবে না। খাঁ মরহুম তাঁহার ঐ জঘন্য ভাবধারাকে উক্ত পরিচ্ছেদের শেষ লাইনগুলিতে আরও অধিক উলঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন– "যিনি হযরতের জীবনী আলোচনায় সত্য-মিথ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে চান তাঁহার পক্ষে এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা বেশী আয়াসসাধ্য নহে। তবে বাপ-দাদার কথা, পূর্বতন আলেমগণের নজির, মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিধারা ইত্যাদির চোখ-রাঙ্গানীকে যিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব।"

আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করুন! তের শত বৎসর পরে মুসলিমগণের নজির লক্ষ্য করিলে তাহা মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিতুল্য হইবে– এইরূপ উক্তি করা খাঁ মরহুমেরই দুঃসাহস হইতে পারে। শুধু ঐ উক্তি নহে, তিনি পূর্ববর্তী ইমামগণকে যেভাবে গালিগালাজ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাকালরূপী কতগুলি যুক্তি সত্যের আবরণীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই যুক্তিগুলির ভিতরেও বিষ ঢুকাইয়াছেন অনেক; যদ্বারা তিনি সীমাহীন ধৃষ্টতায় পৌঁছিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরিষ্কার ভাষায় ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব পূর্বতন আলেম এবং ইমামগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন– "বোজর্গানে দীন ও ছলফে-ছালেহীন' বলিয়া মুসলমান সমাজে যেসকল 'তাগুতের' সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সর্বনাশের মূল।"

পাঠক! মুসলিম সমাজের 'বুজর্গানে দ্বীন' কোন্ কোন্ শ্রেণী খাঁ মরহুম পরবর্তী পৃষ্ঠায় তাহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার উক্তি–"অমুক ইমাম বলিয়াছেন, অমুক পীর বলিয়াছেন, অমুক আলেম লিখিয়াছেন– ইহারা হইতেছেন বোজর্গানেদ্বীন।" এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা গেল– ইমাম, আলেম, পীর– ইহারাই বোজর্গানে দ্বীন।

সল্‌ফে সালেহীন অর্থও বুঝুন! 'সলফ' অর্থ পূর্বতন, আর 'সালেহীন' অর্থ নেক্‌কার ব্যক্তিবর্গ; সলফে সালেহীন অর্থ পূর্বতন নেক্‌কার ব্যক্তিবর্গ।

এই সুধী শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরহুম একটি আরবি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, 'তাগূত'। এই শব্দটির অর্থে বাংলা শব্দ এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে মুসলিম সমাজ খাঁ মরহুমের মুখে কি দিত তাহা বলা যায় না, তবে তিনি ক্ষমা পাইতেন না নিশ্চয়। 'তাগূত' শব্দটি পবিত্র কোরআনের আয়াতুল কুরসীতে উল্লিখিত রহিয়াছে। কাফের-মোশরেক পৌত্তলিকগণের পূজনীয়দের উদ্দেশে 'শয়তান' বা দেবদেবী অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেমতে খাঁ মরহুমের উক্তির অর্থ দাঁড়ায়– ইমাম, আলেম, পীর ও নেককার ব্যক্তিবর্গ বলিয়া মুসলমান সমাজে যেসকল শয়তান বা দেবদেবীর সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই হইতেছে সমস্ত সর্বনাশের মূল। এই জঘন্য উক্তির প্রতিবাদের ভাষা জগতে আছে কি?

পাঠক! আপনারা ভাবিতে পারেন এবং খাঁ মরহুম এই ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছেনও বটে যে, তাঁহার কটাক্ষ ও আক্রোশ শুধু কল্পিত ও ভুয়া বুজুর্গদের সম্পর্কে এবং নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবনী সংক্রান্ত রচিত অপ্রামাণিক উর্দু, ফার্সী ইত্যাদি চটি বই-পুস্তক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ।

খাঁ মরহুমের পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতার আবরণে অসংখ্য ধোঁকা-ফাঁকির ইহাও একটি । তাঁহার অসার পেঁচালো মন্তব্যসমূহে তিনি ঐরূপ হাবভাব দেখাইয়া এবং ঐ শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করিয়া সমাজের ধিক্‌কার ও ক্ষোভ হইতে গা-ঢাকা দেওয়ার মতলব করিয়াছেন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার উদ্দেশ্য ঐরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

প্রথমতঃ পূর্ব যুগে 'ইমাম' আখ্যার ভুয়া কল্পিত পাত্র ছিল বলিয়া কোন ইতিহাস আমাদের জানা নাই। তবে আলেম ও পীর নামের ভুয়া লোক থাকা স্বাভাবিক। জগতের অন্যান্য শ্রেণীতেও তাহা আছে; যেমন–

ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিভিন্ন প্রশাসক ইত্যাদিতেও ভুয়া ব্যক্তি আছে; সেই জন্য তাহাদিগকে শ্রেণীগতভাবে গালি দিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উক্তি কি ক্ষমার যোগ্য হইবে?

অধিকন্তু পূর্ব যুগে, মুসলমানদের সোনালী আমলে– যখন ইসলামী শাসন প্রচলিত ছিল, তখন আলেম পীর ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষার উর্ধ্বতন আখ্যাসমূহ ভুয়ারূপে নিতান্ত কমই অবলম্বিত হইতে পারিত; যেমন– বর্তমান যুগে ভুয়া সামরিক অফিসার ও উচ্চস্তরের ভুয়া প্রশাসক ইত্যাদি হওয়া কি সহজ ব্যাপার? ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরবময় শাসন আমলে সামরিক অফিসার বা প্রশাসকদের আখ্যাসমূহ অপেক্ষা 'আলেম' 'পীর' ইত্যাদি আখ্যা বহু পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ ইমাম, আলেম ও পীর শ্রেণীর যেসব বিশিষ্ট মনীষীর জ্ঞান ভান্ডার রচনা ও সঙ্কলন আকারে জাতীয় রত্নরূপে সুরক্ষিত রহিয়াছে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ত ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরব এবং অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয়ত ঃ খাঁ মরহুম প্রকৃত প্রস্তাবে ভুয়া ও কল্পিত বুজুর্গ নামীয় চুনোপুঁটি আটকাইবার জন্য সুবৃহৎ উপক্রমণিকার জাল ফেলেন নাই; তিনি ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিমের ন্যায় বড় বড় মোহাদ্দেছ, ইসলাম ও মুসলমান জাতির গৌরব– রুই-কাতলা আটকাইবার উদ্দেশে ঐ জাল ফেলিয়াছেন। তিনি উর্দু-ফার্সী চটি বই মুছিবার জন্য এত পাণ্ডিত্য ব্যয় করেন নাই। তিনি ৬০০–৭০০ বৎসর হইতে প্রচলিত ৪০০০–৬০০০ পৃষ্ঠায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ও মোফাসসেরগণের জ্ঞানগর্ভময় জাতীয় সম্পদ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীকে উপেক্ষণীয় ও প্রক্ষিপ্ত সাব্যস্ত করার কুমতলব আঁটিয়াছেন। এই সত্যের মাত্র কতিপয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন–

(১) কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার কুদরতে আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চন্দ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছেন– আমরা যথাস্থানে এই মো'জেযার প্রামাণিক সুদীর্ঘ আলোচনা পেশ করিব।

খাঁ মরহুম মোস্তফা চরিত রচনা করিয়াছেন; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মোজেযা সম্পর্কিত কোন আলোচনা তাহাতে নাই। এমনকি এই বিখ্যাত মোজেযাটিরও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেও আমাদের আপত্তি ছিল না, এত বড় মোজেযাও বর্ণনা না করা তাঁহার অভিরুচি মনে করিতাম। কিন্তু মোজেযা অস্বীকারের বাতিক খাঁ মরহুমকে এই এ ক্ষেত্রেও রেহাই দেয় নাই। তিনি তাঁহার উপক্রমণিকায় কৌশলের সহিত তাহা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন–

"আমাদের অধিকাংশ লেখকের যুক্তিধারা এই যে, আল্লাহ তাআলার সর্বশক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আজগবী ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন; যথা– যে আল্লাহ চাঁদ-সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি চাঁদকে দু'টুকরা করিতে পারেন না? –আমরা এই বন্ধুদের যুক্তি স্বীকার করিয়া নিবেদন করিব, আল্লাহ করিতে পারেন সব– তোমাকে বা আমাকে পাগল করিতে পারেন। তাই তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল গণ্য করিব? ইহা যে ঘটিয়াছে– ঐতিহাসিকভাবে তাহার প্রমাণ দাও।"

ধৃষ্টতার সীমা আছে কি? বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফসহ অসংখ্য কিতাবের হাদীসসমূহে প্রমাণিত এবং হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত সীরাত শাস্ত্রের বড় বড় প্রামাণিক কিতাবে বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ মোজেযাটিকে খাঁ মরহুম আজগবী ঘটনা বলিতে সাহস করিয়াছেন। আরও আশ্চর্যজনক এই যে, বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী শরীফ কিতাবসমূহে এই মোজেযার প্রমাণে সুস্পষ্ট হাদীছ এবং অসংখ্য সীরাত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবী করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়া পিতার পরিচয়ে আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের সাক্ষ্য, এমনকি মাতার রেজেস্ট্রীকৃত বিবাহের কাবিন নামাও উপেক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবী উত্থাপন অপেক্ষা অধিক আজগবী ও আশ্চর্যজনক দাবী তাহা নহে কি? বাকপটু চতুর খাঁ মরহুম সরলপ্রাণ পাঠকদেরকে ধোকা দেওয়ার কী অপচেষ্টা করিয়াছেন! তাঁহার বর্ণনার হাবভাবে মনে হয়– আল্লাহর কুদরতে চাঁদ দু'টুকরা হওয়া শুধু সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্বাপর মুসলিম সমাজ উক্ত মোজেযায় বিশ্বাস করিয়া নিয়াছে। অথচ বহু সংখ্যক হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ

বিদ্যমান আছে, এমনকি বোখারী শরীফের দুই স্থানে এই মোজেযাটির আলোচনা রহিয়াছে এবং একাধিক সুস্পষ্ট সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে– যথাস্থানে আমরা তাহা পেশ করিব। খাঁ মরহুম ঐসব দলীল-প্রমাণ হইতে পাশ কাটিয়া বিভ্রান্তিকর উক্তি করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; এতদপেক্ষা ধৃষ্টতা কি হইতে পারে!

পাঠক! আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন কি, খাঁ মরহুম তাঁহার কোন কোন বক্তব্যে এই ধূম্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃস্টের জীবনী গ্রন্থের ন্যায় আজগবী গল্প-গুজবের পুস্তকাবলী এবং বীর হুনুমানের পুঁথি ও বিভিন্ন পঞ্জিকা শ্রেণীর সীরাত সঙ্কলনসমূহের খণ্ডন করিতে চাহেন। আর ভন্ড, ভুয়া, কল্পিত আলেম ও পীরদিগকে নাজেহাল করিতে খাঁ মরহুমের এই হাব ভাব এবং এই শ্রেণীর কথা ধোকা ও ফাঁকি মাত্র। বস্তুতঃ তিনি এই সব বলিয়াছেন মানুষকে ধোকায় ফেলিয়া পানি ঘোলাটে করার জন্য এবং সেই ঘোলা পানিতে বড় বড় রুই-কাতল শিকার করার উদ্দেশে। নতুবা তিনি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা অস্বীকার করিলেন কেন? তাহা ত গল্প-গুজবের ও পুথি-পুস্তকের বর্ণনা নহে, তাহা ত বড় বড় হাদীছ গ্রন্থের এবং বড় বড় সীরাত-সঙ্কলনসমূহের বর্ণনা, তাহা ত অনেক সংখ্যক সহীহ-শুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

দেখুন! বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মেশকাত শরীফ ইত্যাদি পাক-পবিত্র গ্রন্থাবলী কি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃস্টের জীবনী গ্রন্থের ন্যায় আজগবী গল্প-গুজবের বই? ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ)সহ অসংখ্য সীরাত সঙ্কলক ইমামগণ কি ভুয়া কল্পিত শ্রেণীর ইমাম ও আলেম!

হাজার বৎসরের অধিক কাল হইতে বরণীয় ঐসব পাক-পবিত্র মহাগ্রন্থবালীতে বর্ণিত এবং ঐসব পবিত্রাত্মা ইমামগণের প্রামাণিক বর্ণনায় প্রাপ্ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে অস্বীকার কেন করা হইল? ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবীর ধুয়া ত এই ক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর; হাদীছ গ্রন্থাবলীর মর্যাদা ও প্রামাণিকতা ইতিহাস অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ উর্দ্ধের। এতদ্ভিন্ন তাহা সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনাও ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে।

খাঁ মরহুমের ধৃষ্টতা শুধু এই একটি মোজেযা সম্পর্কেই নহে; শক্কে সদর বা বক্ষ বিদারণ মোজেযা সম্পর্কেও তিনি সেই অপকর্মই করিয়াছেন। বোখারী, মুসলিম ও মেশকাতসহ বহু হাদীছ গ্রন্থে এবং সীরাত শাস্ত্রের সমস্ত প্রামাণিক কিতাবসমূহেই উক্ত মোজেযাটি বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু খাঁ মরহুম হাদীছ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠকদের সম্মুখে যুক্তি ও পরীক্ষার ভাঁওতা ধরিয়া মিথ্যার সমাবেশ করত ঐ মোজেযা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মিথ্যা সমাজের নজরে ধরাইয়া দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে, কিন্তু খাঁ মরহুমের এই শ্রেণীর কুকর্ম এতই অধিক যে, ঐ সবের শুধু ফিরিস্তি লিখিতে গেলেও সীরাতও সঙ্কলনের কাজ বাদ দিয়া বসিতে হইবে।

সওর পর্বত গুহার মোজেযা এবং হিজরত সফরের অন্যান্য মোজেযাসমূহকে তিনি একই অপকৌশলে অস্বীকার করিয়াছেন। মে'রাজ শরীফের ন্যায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রখ্যাত মোজেযাকে খাঁ মরহুম স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া স্বাভাবিকতার গণ্ডিভুক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য নবীগণের মোজেযাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন– যাহার নমুনা বোখারী চতুর্থ খণ্ডের বিভিন্ন নোটে বর্ণিত আছে।

খাঁ মরহুম মোজেযা অস্বীকার করেন– সরাসরি এই মতবাদ তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই; বরং তাহার বিপরীতই হয় ত লিখিয়া থাকিবেন; নতুবা ধোকার ধূম্রজাল ত পূর্ণ হইবে না এবং সমাজও ক্ষমা করিবে না। কিন্তু কার্যতঃ তিনি কি করিয়াছেন তাহা দেখা প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী নবীগণের মোজেযায় বর্ণিত আয়াতসমূহের বিকৃতি সাধনে এই মোজেযাসমূহের যেভাবে খণ্ডন তিনি করিয়াছেন তাহা অতীব দুঃখজনক। আর নবী (সঃ)-এর কি কি মোজেযা তিনি স্বীকার করিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া যাইবে। তাঁহার মোস্তফা চরিতে মোজেযা খণ্ডন করা ছাড়া

মোজেযা বয়ানের কোন পরিচ্ছেদ নাই। খাঁ মরহুমের দৌরাত্ম্য আরও সম্প্রসারিত; এই সম্প্রসারিত দৌরাত্মে তিনি মুসলমানদের এত বড় ক্ষতি করিয়াছেন যাহা কোন অমুসলিমও করিতে সাহস পায় নাই।

মুসলমান জাতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এবং ছাহাবীগণের পরে হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত ইসলাম লাভ করিবে দুইটি মহাবস্তুর মাধ্যমে– একটি পবিত্র কোরআন আর একটি সুন্নাহ বা হাদীছ। মুসলিম সমাজ কোরআনও লিপিবদ্ধাকারে লাভে করিয়াছে। হাদীছও বিভিন্ন গ্রন্থরূপ লিপিবদ্ধাকারে লাভ করিয়াছে। প্রচলিত বিশিষ্ট হাদীছ গ্রন্থসমূহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাত্র দুই-আড়াই বা তিন শত বৎসর পরেই সঙ্কলিত হইয়াছে। তখন ইসলামের সোনালী যুগ ছিল, যাহা দীর্ঘ দিন চলিয়াছে। তখন হইতে হাজার হাজার হাদীছ বিশারদ হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ চুলচেরা অনুসন্ধানে দুইখানা হাদীছ গ্রন্থকে সহীহ্– বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতায় সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছেন। (১) সহীহ্ বোখারী শরীফ (২) সহীহ্ মুসলিম শরীফ– সহীহ্ বা শুদ্ধ গুণবাচক শব্দ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নামের অংশরূপে হাজার বৎসরের অধিককাল হইতে বিশ্ব মুসলিম কর্তৃক প্রচলিত। মুসলিম সমাজ নির্দ্বিধায় এই গ্রন্থদ্বয় হইতে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেছে।

দীর্ঘ হাজার বৎসরের অধিককাল পর খাঁ মরহুম সবুজ-শ্যামল ঘাসে আচ্ছাদিত গোবর স্তূপতূল্য তাঁহার উপক্রমণিকায় বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত মহান গ্রন্থদ্বয়ও সংশয়মুক্ত নহে; উক্ত গ্রন্থদ্বয়েও অশুদ্ধ, অপ্রকৃত ও ভুল হাদীছ রহিয়াছে।

পাঠক! খাঁ মরহুমের লেখা পড়িলে ভাবিতে পারেন– তিনি ত দলীল-প্রমাণ দিয়াই দেখাইয়াছেন, বোখারী শরীফে ভুল হাদীছ আছে। তাঁহার প্রদত্ত দলীল-প্রমাণের স্বরূপ এখনই দেখিতে পাইবেন। তবে প্রথমে একটি সরল কথা অনুধাবন করুন। হাফেজে হাদীছ ইবনে-হাজার (রঃ) লক্ষ লক্ষ হাদীছ যাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ৬০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার সাধনাময় জীবনের বিরাট অংশ বোখারী শরীফের গবেষণায় ব্যয় করিয়া প্রায় ৭০০০ পৃষ্ঠায় তাহার ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপই হাফেজে হাদীছ আঈনী (রঃ) প্রায় ২০,০০০ পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কাস্তালানী (রঃ) ৫,০০০ পৃষ্ঠা ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কেরমানী (রঃ)-ও ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। হাদীছ শাস্ত্রের গবেষণায় জীবন ব্যয়কারী এই মহামনীষীগণ বোখারী শরীফের উপর সুদীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া তাহার এত বড় বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়া গেলেন, অথচ তাঁহারা এই সব ভুল হাদীছ দেখিলেন না, যেগুলি পণ্ডিত খাঁ মরহুম দেখিতে সক্ষম হইলেন! এই সহজ-সরল সত্যের আলোতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, প্রকারান্তরে খাঁ মরহুমের সমালোচনা শুধু ইমাম বোখারী (রঃ)-কেই ঘায়েল করে নাই; ৬০০ বৎসর হইতে প্রচলিত উক্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের রচনাকারী মহামনীষীগণকেও বোকা বানাইয়াছে।

ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা থাকিতে পারে কি? খাঁ মরহুম মাকড়সার জালের আশ্রয় লইয়া পাহাড়ের সহিত টক্কর দেওয়ার ন্যায় যেসব ছুতা তার আঁচল ধরিয়া বোখারী শরীফের হাদীছকে ভুল সাব্যস্ত করিয়াছেন, ঐসব কোনটাই তাঁহার আবিষ্কার নহে। মুসলিম জাতির ঈমানী বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্বল করার সম্ভাব্য চেষ্টারূপে যেসব ছল-ছুতার জন্ম দেওয়া যাইতে পারে, উম্মতের হিতৈষীগণ পূর্ব আমলেই সেই সবের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফের গবেষণাকারীগণ নিজ নিজ রচনায় ঐ সবের ধূম্রজাল ছিন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত খাঁ মরহুম কোথাও বিষজনিত ঐসব ছল-ছুতার খোঁজ পাইয়াছেন; কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার দৌড় তাঁহাকে বোখারী শরীফের উল্লিখিত ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। ফলে তিনি ঐ বিষয়ে প্রতিষেধক হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছেন এবং বাংলাভাষী ভাইদের জন্য ঐ বিষ আমদানী করিয়াছেন। বাংলাভাষী পাঠক ভাইগণ হাদীছ শাস্ত্রের কী জ্ঞান রাখেন যে, তাঁহারা এই বিষয়ে প্রতিষেধক খোঁজ করিয়া বাহির করিবেন। আরও পরিতাপের বিষয়– ভাষা সম্রাট বাকপটু পণ্ডিত খাঁ মরহুম

নিজ প্রতিভা দ্বারা উক্ত বিষকে এমন সুন্দর সাজে সাজাইয়াছেন, হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠক তাহা গলধঃ করিবেই। সুতরাং খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপকর্ম দ্বারা বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন; তাহাদের জন্য শুধু বিষের দোকান সাজাইয়া গিয়াছেন।

নবীগণের মো'জেযা অস্বীকারের ন্যায় খাঁ মরহুম আরও অনেক সত্যকে অস্বীকার করিতেন। যথা– জিন জাতির অস্তিত্ব, ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য; ঈসা আলাইহিস সালামের কোন কোন বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। বোখারী, মুসলিম শরীফ এবং হাদীছ ভাণ্ডারের অনেক হাদীছ ঐ সত্য অস্বীকার করার অন্তরায় হয়; সে বাধা অপসারণে খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থাবলীকে ঘায়েল করার এই অপচেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন খাঁ মরহুমের তফসীর নামে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং "মোস্তফা চরিত" পাঠ করিলে মনে হয় যেন বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থসমূহের হাদীছ অস্বীকার ও ভুল সাব্যস্ত করিয়া তিনি বাহাদুরী দেখাইবার স্বাদ অনুভব করিতেন। যেমন— কেহ পিতাকে খুন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করার আনন্দ উপভোগ করে।

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ঐরূপ কোন কোন হাদীছ অস্বীকার এবং তাহা খণ্ডনের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এস্থলে সংক্ষেপে শুধু ঐ হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা হইবে যাহা তিনি মোস্তফা চরিতের উপক্রমণিকায় তাঁহার কথিত হাদীছ "পরীক্ষার নূতন ধারা" পরিচ্ছেদে ভুল হাদীছের নমুনারূপে পেশ করিয়া বলিয়াছেন– "সনদ সহীহ হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীছগুলি নির্দোষ, প্রকৃত এবং সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না।" বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ সম্পর্কে এই দাবী যে, সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না; তাহাও নেহাত তুচ্ছ হেতুর অজুহাতে– ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা বৈ নহে।

খাঁ মরহুমের ভাষায় "প্রথম প্রমাণ" অর্থাৎ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে যে ভুল হাদীছ রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ বা নমুনা "আনাছ (রাঃ) বলিতেছেন, يايها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى 'হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের স্বর ঊর্ধ্বে চড়াইও না।" এই আয়াতটি নাযিল হইলে সাবেত বিন কায়স ছাহাবীর খুব ভয় হইল; তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। তাই তিনি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন না, বাড়ীতে থাকেন। কয়েক দিন ঐভাবে অতীত হইলে হযরত (সঃ) সা'দ-বিন-মোআয নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবেতকে দেখি না কেন, তাহার কি অসুখ হইয়াছে? সা'দ বিন মোআয সাবেতের বাড়ীতে গমন করিলেন ও সাবেতকে হযরতের প্রশ্নের কথা জানাইলেন। সাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের নরকী হওয়ার আশঙ্কা জানাইলেন। সা'দ বিন মোআয সাবেতের আশঙ্কা প্রকাশ নবীজী (সঃ)-কে জ্ঞাত করিলেন। তিনি বলিলেন, বরং সে বেহেশতী।

খাঁ মরহুমের বক্তব্য, এই হাদীছটি সত্য হইতে পারে না– কারণ, ঘটনায় উল্লিখিত আয়াতটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়, আর সা'দ বিন মো'আযের মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে।

পাঠক! হাদীছখানাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটি ভিত্তি হইল, হাদীছটির আলোচ্য আয়াত নবম হিজরী সনে নাযিল হইয়াছে– এই বিষয়টি বিতর্কমূলক। প্রসিদ্ধ হাফেযে হাদীছ ইবনে হাজার (রঃ) ভিন্ন মতের অবকাশ দেখাইয়াছেন।

খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ তফসীর অধ্যায়ের যে হাদীছের বরাত দিয়াছেন, বোখারী শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায়ই হাফেয ইবনে হাজারের অবকাশ প্রকাশের সমর্থন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিতর্কমূলক একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছকে অবাস্তব-অসত্য বলা ক্ষমাহীন অপরাধ নহে কি? আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইল যে, ৬০০ শত বৎসর পূর্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে প্রশ্নের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন সেই প্রশ্নের মৃত লাশ বাহির করিয়া হাদীছ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতাহীন বাংলাভাষী পাঠকদিগকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে– ইহা অপরাধ নহে কি?

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) যে ধারায় প্রশ্নের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা হাদীছ ও তফসীরের শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আমরা অন্য একটি সরল-সহজ পয়েন্ট পেশ করিতেছি– তাহাও পূর্ব আমলের গবেষকগণই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফের দুই স্থানে ৫১০ ও ৭১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে একই সনদ তথা সাক্ষ্য সূত্রে। মুসলিম শরীফে হাদীছখানা একই জায়গায় পর পর ৬টি সনদে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব হাদীছখানার মোট সাক্ষ্য সূত্র বা সনদ হইল পাঁচটি। পাঠক! ইহা একটি মহাসত্য যে, হাদীছকে তাহার আসল জায়গায় সরাসরিভাবে গবেষণা না করিয়া শুধু ধার করা জ্ঞানে তথা উদ্ধৃতি বা অনুবাদ দেখিয়া কোন হাদীছ সম্পর্কে মুখ খোলা মহাপাপ। এই মহাপাপের পরিণাম এখানে লক্ষ্য করুন। মরহুম খাঁ সাহেব একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও স্বভাব-জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বোখারী শরীফ মূল গ্রন্থ হইতে দূরে থাকিয়া শুধু উদ্ধৃতি দেখার ধার করা জ্ঞানে দূর হইতেই ঢিল ছুঁড়িয়াছেন। নতুবা তিনি উল্লিখিত হাদীছের সমালোচনা করিতে বোখারী শরীফের নাম মুখে বা লিখনীতে আনিতেন না। কারণ, তাঁহার সমালোচনার দ্বিতীয় ভিত্তি ছিল হাদীছটির বর্ণনায় সা'দ বিন মোআযের উল্লেখ; যেহেতু তাঁহার মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে। পাঠক! শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, বোখারী শরীফের দুই স্থানে হাদীছখানা বর্ণিত, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই সা'দ বিন মোয়াযের নাম নাই। বরং আছে فقال رجل انا اعلم অর্থাৎ নবীজী (সঃ) সাবেত বিন কায়সের আলোচনা করিলে এক ব্যক্তি বলিল, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাঁহার সংবাদ জানিয়া আসিব।"

পাঠক! লক্ষ্য করুন– সমালোচনার ভিত্তিটাই যখন বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান নাই, তখন সমালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, "বোখারী ও মুসলিমে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে"– ইহা কতটুকু ঈমানদারী তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

তারপর আসুন! মুসলিম শরীফে হাদীছখানার অবস্থা দেখুন! পূর্বেই বলা হইয়াছে– শুধু উদ্ধৃতি দেখার ন্যায় ধার করা জ্ঞানে হাদীছ সম্পর্কে কিছু বলা নিতান্তই অবান্তর। খাঁ মরহুমের সমালোচিত হাদীছখানা মুসলিম শরীফে চারিটি সনদ তথা সাক্ষ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে উল্লেখ হইয়াছে ঐ সাক্ষীর বর্ণনা যাহার বর্ণনায় খাঁ মরহুমের সমালোচনার ভিত্তি বস্তু তথা "সা'দ বিন মোআয" নাম বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠক আশ্চর্যান্বিত হইবেন, মুসলিম (রঃ) বিভ্রান্তি হইতে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থা রাখিয়াছেন তাহা হইতে খাঁ মরহুম নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া এবং পাঠককে অজ্ঞ রাখিয়া সেই বিভ্রান্তিতে নিজেও পতিত হইয়াছেন এবং অপরকেও পতিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কেলেঙ্কারির একমাত্র কারণ হইল মুসলিম শরীফ মূলগ্রন্থ দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা।

দেখুন! মুসলিম শরীফে বিভ্রান্তি অবসানের কী সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটি সাক্ষীসূত্রে ঐ সমালোচনার বস্তু সম্বলিত বিবরণ উল্লেখের সাথে সাথেই ঐ হাদীছটির অপর তিনটি সাক্ষ্যসূত্র বর্ণিত রহিয়াছে। এই সাক্ষীগণের বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে–

ليس فى حديثه ذكر سعدبن معاذ - لم يذكر سعدبن معاذ

"এই সাক্ষীর বর্ণনায় সা'দ-বিন-মোআযের উল্লেখ নাই। এই সাক্ষ্য সা'দ বিন মোআযের নাম উল্লেখ করেন নাই।" ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় প্রতীয়মান হইল যে, মূল হাদীছটির তথ্য অসত্য বা অপ্রকৃত বলা যাইতে পারে না। কারণ শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনায় একটি নাম উল্লেখের বিভ্রাট থাকিলেও অপর তিন জন সাক্ষীর বর্ণনায় ঐ বিভ্রাটমুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাঠক! একটি ঘটনা সাব্যস্ত করিতে বাদী যদি পাঁচটি সাক্ষী পেশ করে– সে ক্ষেত্রে বিবাদী একটি সাক্ষীর বর্ণনায় দোষ দেখাইতে পারিলে ঘটনাটি মিথ্যা হইয়া যাইবে? ইমাম মুসলিম বিভ্রাট খণ্ডনের জন্য প্রথমে বিভ্রাটযুক্ত সাক্ষ্যসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বিভ্রাটমুক্ত তিনটি সাক্ষ্য সূত্র উল্লেখ করিয়া

প্রথমটির দোষ নির্ণয় এবং তাহার খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার দোষ হইল?

মুসলিম শরীফের চারি সাক্ষ্যসূত্র এবং বোখারী শরীফের এক সাক্ষ্য সূত্র– এই পাঁচটি সাক্ষ্যসূত্রের একটি সাক্ষ্যসূত্র বিতর্কমূলক; চারিটি সাক্ষ্য সূত্র সম্পূর্ণ নির্মল নির্দোষ, এমতাবস্থায় আইনে বা বিচারে কি উক্ত ঘটনা মিথ্যা বলার অবকাশ আছে?

অতপর সুধী মহল সম্মুখে আরও একটি তথ্য বিতর্কের জন্য নহে, বিচারের জন্য পেশ করিতেছি। একটি সাক্ষীর বর্ণনায় যে সা'দ বিন মোআযের নাম উল্লেখের বিভ্রাট রহিয়াছে তাহাও অতি নগণ্য। ছাহাবীগণের নাম পর্যালোচনায় দেখা যায়, ছাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন সা'দ বিন মোআজ, আর একজন ছিলেন আদ বিন মোআয, আর একজন ছিলেন সা'দ বিন ওবাদা।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সা'দ বিন ওবাদা, যাঁহার মৃত্যু নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনেক পরে। সুতরাং তাঁহার নামের বেলায় কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন– ছাহাবীদের যুগে নহে; ইহারও পরে তথা ঘটনার অনেক বৎসর পরে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানবান অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি সা'দ নামও ঠিক বলিয়াছিলেন, শুধু কেবল বিন ওবাদা স্থলে বিন মোআয বলিয়া পিতার নাম ব্যতিক্রম বলিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উক্ত সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তিন জন সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ঐ ব্যতিক্রমটা ধরাইয়াও দিয়াছেন। এখন শুধু ঐ ব্যতিক্রম পুঁজি করিয়া অন্য সব রকম দোষমুক্ত একটি সুদীর্ঘ হাদীছের সর্বময় বিবরণকে অপ্রকৃত ও অসত্য বলা এবং ইমাম মুসলিম কর্তৃক ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দেওয়ার কথা গোপন করিয়া বোখারী মুসলিমে অসত্য হাদীছ আছে বলা কত দূর ঈমানদারী তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

খাঁ মরহুম তাঁহার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের জন্য পথ পরিষ্কারের উদ্দেশে খেয়াল-খুশীমত হাদীছ এন্‌কার-অস্বীকার করার জন্য "পরীক্ষার নূতন ধারা" নামে একট ফাঁদ তৈয়ার করিয়াছেন। মাকড়সার জালে তৈয়ারী সেই ফাঁদে তিনি বোখারী শরীফ মুসলিম শরীফের ন্যায় শক্তিশালী গ্রন্থাবলীর হাদীছ আটকাইতে যাইয়া দশটি নমুনা প্রমাণরূপে পেশ করিয়াছেন।

তাঁহার সবগুলি প্রলাপের উত্তর দিতে গেলে অহেতুক সময় অপচয়ের যাতনা পোহাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন হাদীছ শাস্ত্র এবং বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠকদের চোখে তাঁহার প্রলাপগুলি পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতার প্রলেপে সুন্দর দেখাইবে বটে, কিন্তু যেকোন খাঁটি আলেমের নিকট হইতে ঐ সব প্রলাপের সুষ্ঠু সুরাহা প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারেন। যেমন– নবী (সঃ)-এর বয়সের সংখ্যার তিনটি হাদীছের কোন দুইটি অসত্যই মনে হইবে। কিন্তু তাহার খণ্ডন অতি সহজ। নবীজী (সঃ)-এর বয়স আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইব।

হাদীছ মোটেই না বুঝিয়া, এমনকি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলীতে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মূলগ্রন্থ তলাইয়া দেখার যোগ্যতার অভাবে অজ্ঞ থাকায় যেসব প্রলাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখিলে ত গাত্রদাহ এবং ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মে। যথা–

বোখারী শরীফের একটি হাদীছ প্রথম খন্ডে ৪ নম্বরে অনূদিত– তাহাতে সূরা কেয়ামার একটি আয়াতের শানে নযুল বর্ণিত আছে। ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম যুগে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যাস ছিল, জিব্রীল ফেরেশতা ওহী পঠনকালে নবীজী (সঃ) তাহা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়া পড়িতে থাকিতেন। নবীজী (সঃ)-কে এই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে এই আয়াত নাযিল হইল لا تحرك به لسانك لتعجل به "তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ করার জন্য মুখ নাড়িয়া এই ওহী (সদ্য অবতারিত কোরআনের আয়াত)সমূহকে আপনার পড়িতে হইবে না; আমার দায়িত্বে থাকিল আপনাকে তাহা কণ্ঠস্থ করানো এবং পঠনের শক্তি দেওয়া।"

হাদীছে আছে, উক্ত বিবরণটি বর্ণনা করিতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় শার্গেদকে বলিয়াছেন, আমি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে যেভাবে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি সেইভাবে আমিও তোমাকে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব।

খাঁ মরহুম বুঝিয়াছেন– এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যে নবীজী (সঃ) ওহী সংরক্ষণে ঠোঁট নাড়িতেন অর্থাৎ যেই ঠোঁট নাড়া উপলক্ষ করিয়া তাহা বন্ধ করার জন্য উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) যেই ঠোঁট নাড়াই দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন। এই বুঝের বশেই খাঁ মরহুম লাফাইয়া পড়িয়াছেন উক্ত হাদীছকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে এবং বলিয়াছেন যে, "সূরা কেয়ামা (উক্ত সূরার উল্লিখিত আয়াত) যখন নাযিল হইয়াছিল তখন ইবনে আব্বাসের জন্মই হয় নাই। অতএব উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে কোরআন নাযিল হওয়ার সময় হযরতের 'ঠোঁট নাড়া' দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, সনদের হিসাবে হাদীছ সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও যুক্তির হিসাবে তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।"

নিজের আন্দাজ না করিয়া বড় কথা বলার পরিণামে এইভাবে মানুষ বিড়ালের মূত্রে আছাড় খায়। খাঁ মরহুম এস্থলে নিজেই ভুল বুঝিয়াছেন এবং সেই ভুল বুঝের পরিণামে বোখারী শরীফের হাদীছকে অসত্য বলার অভিশাপে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ হাদীছের সঠিক তাৎপর্যে সংশয়ের অবকাশ নাই। হাদীছটির তাৎপর্য এই–

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ইহধাম ত্যাগের প্রাক্কালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরিণত বয়সের নিকটবর্তী ছিলেন মাত্র; তবুও পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে তিনি এতই পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) পর্যন্ত কোরআনের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়া থাকিতেন (১৭১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। ইবনে আব্বাসের এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম সূত্র ছিল এই যে, তিনি নবীজী (সঃ) হইতে কোরআনের আয়াতসমূহের জ্ঞান আহরণে সদা সর্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার সেই তৎপরতা ধারায় কোন একদিন সূরা কেয়ামার আলোচ্য আয়াতটি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বুঝিতে চাহিলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহাকে উক্ত আয়াতের মর্ম ব্যাখ্যা করিতে আদ্যপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বুঝাইলেন। তখন আয়াতটির শানে নযুল বা মূল উদ্দেশ্য– জিব্রাঈলের সঙ্গে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখ নাড়িয়া পঠনের বিষয়টিও উল্লেখ করিলেন। এমনকি নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে যে মুখ নাড়িয়া জিব্রাঈলের সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন, তাহার দৃশ্যও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে দেখাইয়াছিলেন। সেই দেখানো প্রসঙ্গে নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছিলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। পরবর্তীকালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বীয় শার্গেদকে বলিয়াছেন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাকে তাঁহার ঠোঁট নাড়ার দৃশ্য দেখাইবার সময় আমি তাঁহাকে যেইরূপে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি, তোমাকেও আমি ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব। এই বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ শার্গেদক ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইলেন। এমনকি পরম্পরা প্রত্যেক ওস্তাদ নিজ নিজ শার্গেদকে এই হাদীছ পড়াইতে ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইয়াছেন। সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর যাবত এই হাদীছ শিক্ষাদানে ঐ ঠোঁট নাড়িবার নীতি বজায় রহিয়াছে। আমাদের ওস্তাদ আমাদিগকে তাহা দেখাইয়াছেন; আমরা আমাদের শার্গেদগণকে তাহা দেখাইয়া থাকি। এইভাবে এই হাদীছটির মধ্যে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একটি মোবারক স্মৃতি চৌদ্দ শত বৎসর হইতে চলমান রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই হাদীছখানাকে "মোসালসাল বি-তাহ্রীকিশ শাফাতাইন" অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে ঠোঁট নাড়িবার স্মৃতি বহনকারী হাদীছ বলা হয়।

হাদীছটির এই ব্যাখ্য নূতন আবিষ্কার বা খাঁ মরহুমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নহে। ছয় শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফতহুল বারীতে স্বয়ং ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তির প্রমাণ দ্বারা এই ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

অপবাদের আশ্রয়

খাঁ মরহুমের রচনাবলীতে বহু সত্যের অস্বীকৃতি রহিয়াছে। সত্যের শক্তি এত প্রবল যে, একটি সত্য অস্বীকার করিতে অনেক রকমের মিথ্যা জোটাইতে হয়। খাঁ মরহুমের দশা তাহাই হইয়াছে। সত্য শুদ্ধ সহীহ হাদীছ অস্বীকার করার অভিনব ফাঁদ– তিনি নাম রাখিয়াছেন "পরীক্ষার নূতন ধারা"। সত্য অস্বীকারের এই ফাঁদের ভিত্তিরূপে একটি মহা মিথ্যা জোটাইয়া আনিতে হইয়াছে তাঁহাকে। তিনি পূর্বতন মোহাদ্দেসবৃন্দের প্রতি ভিত্তিহীন অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা হাদীছকে সহীহ-শুদ্ধ সাব্যস্ত করিতে শুধু সনদের যাচাই করিতেন; হাদীছের আভ্যন্তরীণ দার্শনিক দিক যাচাই করিতেন না।

খাঁ মরহুম নিজেই এক পরিচ্ছেদে " দেরায়াত"-এর আলোচনা করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন– আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম সমালোচনা এবং পূর্বতন বহু মোহাদ্দেসগণের এই পন্থার যাচাইয়ের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। দেখুন! তিনি নিজেই স্বীকার করিলেন, মোহাদ্দেসগণ হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাইও করিতেন। এই স্বীকৃতির সম্মুখে পূর্বোল্লিখিত মিথ্যা অপবাদ টিকাইয়া রাখিতে চতুর খাঁ মরহুম স্বীকৃতির মধ্যে ফাঁক রাখিয়াছেন– হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাই না করার দোষটা ছাহাবীদের পরে জমাট বাঁধা অন্ধকারময় মধ্যযুগীয় মোহাদ্দেসগণের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে।

খাঁ মরহুমের কথা মানিয়া প্রশ্ন করিব, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম– তাহারা ত ১২০০ বৎসরের অধিক পূর্বের– ছাহাবীদের যুগের দেড় শত বৎসর ব্যবধানের মোহাদ্দেস। তাঁহাদের যাচাই-বাছাই করা হাদীছে আপনি বাড়াবাড়ি কেন করিলেন?

খাঁ মরহুমের যুক্তি ইহাও যে, পূর্বতন মোহাদ্দেসগণ হাদীছের আভ্যন্তরীণ যাচাই করিয়াছেন– তাহা দেখিয়া আমিও করিলাম। এই সীমাহীন ধৃষ্টতা খণ্ডনেও অনীহা সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে এই বলা যায়, পাঁচ-দশ লাখ হাদীছ কণ্ঠস্থকারী, হাদীছ গবেষণায় আজীবন সাধনাকারী মনীষীগণের ভূমিকায় আপনার অবতীর্ণ হওয়ার পরিণাম তাই, যেই পরিণাম বাঁদরের হইয়াছিল অভিজ্ঞ সূতার মিস্ত্রীর অনুকরণে অবতীর্ণ হইয়া।

খাঁ মরহুম তাঁহার উপক্রমণিকায় নীতি নির্ধারণরূপে অনেকগুলি কথাই 'নিয়ম' নামে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। কথাগুলি সুন্দর-সঠিক মনে হইবে, কিন্তু তাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মণ ওজনের বস্তুকে ছটাকের পাত্রে রাখিতেন। যথা– "প্রথম নিয়ম কোরআনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, কোন ইতিহাসে বা চরিত পুস্তকে– এমনকি হাদীছের রেওয়ায়াতেও যদি তাহার বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয় তবে কোরআনের বিপক্ষে অন্য সকল পুস্তকের বা রাবীর বর্ণনাকে আমরা অগ্রাহ্য-অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্ধারণ করিব।" তাঁহার এই নিয়মের কথাটা খুবই সুন্দর ও সঠিক, কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে, বিপরীত হওয়াটা সাব্যস্ত করিবে কে এবং কিরূপ লোকে? খাঁ মরহুমের ন্যায় ভ্রান্ত মতবাদ ও মনোবিকারগ্রস্ত স্বল্প এলেমধারী লোককেও কোরআনের বিপরীত বিষয় সাব্যস্ত করার সুযোগ দেওয়া হইলে কোন নবীর কোন মোজেযা এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ৫৩৭৪ খানা হাদীছ কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। এই সত্যের একটি নমুনা লক্ষ্য করুন–

খাঁ মরহুম আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষেপা; ইহার কারণ জানা নাই। তাঁহাকে ঘায়েল করিবার জন্য খাঁ মরহুম অযথা তাঁহার হাদীছকে কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত করিতেন। যথা– আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছ মুসলিম শরীফে আছে। তাহার বিষয় হইল– নবী (সঃ)-এর বয়ান যে, যমীন-আসমান এবং তাহার মধ্যস্থ পাহাড়-পর্বত, গাছপালা ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিয়াছেন শনিবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত, আর আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবার। খাঁ মরহুম এই হাদীছকে কোরআনের বিপরীত সাব্যস্ত করিয়া আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীকে গাল-মন্দ করিতেন। খাঁ

মিয়া বলেন, উক্ত হাদীছ মতে সৃষ্টির দিনগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭। অথচ পবিত্র কোরআনে ২১ পারা সূরা সেজদার ৪র্থ আয়াতে সৃষ্টির দিনের সংখ্যা সুস্পষ্টরূপে ৬ বলা হইয়াছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) ছাহাবীর প্রতি মনোবিকারগ্রস্ত খাঁ মিয়া তলাইয়া দেখেন নাই যে, উক্ত আয়াতে আসমান-যমীন ও মধ্যবর্তী বস্তু সৃষ্টির দিনগুলিই উল্লেখ করা হইয়াছে, আদম সৃষ্টির কথা তাহাতে নাই, ফলে দিনের সংখ্যা তথায় ৬ হয়। পক্ষান্তরে আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিতে আদম সৃষ্টির একটি দিনও উল্লেখ হইয়াছে, তাই দিনের সংখ্যা ৭ হইয়াছে।

ইহা ত হাদীছ অগ্রাহ্য করার নমুনা। নবীর সীরাত শাস্ত্রের বিবরণ অগ্রাহ্য করার কাহিনী অধিক মর্মান্তিক এবং ইসলামের উপর বাঙ্গালী পণ্ডিতদের এইরূপ অত্যাচার একা আকরম খাঁ মরহুমের নহে, আরও অনেক আছেন। মরা লোকের গ্লানি করার ইচ্ছা হয় না, তবুও প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ মরহুমের কথা বলিতে হয়। তাঁহার মতবাদ ছিল যে, পরকালের মুক্তির জন্য ইসলাম সরল পথ বটে, একমাত্র পথ নহে; অথচ এইরূপ বিশ্বাসে ঈমান নষ্ট হয়। এই দ্বিতীয় খাঁ মরহুমের মৃত্যুমুখে হাসপাতালের জীবনে তাঁহার প্রবন্ধ পত্রিকায় আসিল। তিনি "মোহরে নবুয়ত" অস্বীকার করেন এই দলীলে যে, তাহা থাকিলে নবীজীর জননী বা দাই-মা তাহা অবশ্যই দেখিতেন এবং বয়ান করিতেন; তাঁহাদের হইতে ঐরূপ বর্ণনা নাই। বোখারী শরীফসহ হাদীছের ও সীরাতের কিতাবে প্রমাণিত বস্তুটি তিনি ঐ দলীল দ্বারা মুছিয়া দিলেন। কি দুঃখজনক দলীল! প্রথমতঃ মোহরে নবুয়ত নবীজীর জন্মের অনেক পর বা নবুয়ত প্রাপ্তি লগ্নে প্রকাশ হওয়ার মতামতই প্রবল। জন্ম হইতে থাকিলেও অতি ছোট ছিল, কেহ তাহার গুরুত্ব দেয় নাই। দ্বিতীয়তঃ জননী বা দাই-মাতা হইতে হযরত সম্পর্কে এক-দুইটা কথা ছাড়া কিছুই বর্ণিত নাই। সুতরাং হযরতের কি কিছুই ছিল না! হাদীছে আছে, নবী (সঃ) অতি সুশ্রী সুন্দর ছিলেন। এই খাঁ মিয়ার দলীলে বলা যায় যে, তাহা ঠিক নহে; নতুবা জননী বা দাই-মা তাহা বয়ান করিতেন। এই দলীলে ত নবীজীর শত শত প্রমাণিত গুণ মুছিয়া ফেলা যাইবে।

এই হইল বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের হাল। তাঁহারা পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের বলে ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, যেহেতু তাহার অভিজ্ঞতা নাই। একমাত্র ইসলাম ও কোরআন-হাদীছই এমন লা-ওয়ারিস বস্তু যাহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছাড়া কথা বলা দোষ নহে। বাংলাভাষী জনসাধারণ ভাইদের ঈমান আল্লাহ তাআলাই হেফাযত করুন! আমীন।

——আজিজুল হক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সর্বপ্রথম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	২	হযরতের আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া	৩৯
সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন যোগ্যতায় মুহাম্মদ (সঃ) শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন	৩	খতমে নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর	৪০
হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র	৪	হযরতের নাম	৪১
নিখিল সৃষ্টি হযরতের বিকাশ সাধনে	৫	হযরতের উপনাম	৪৭
বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তি	৬	হযরতের দুগ্ধপান	৪৮
আরশ-কুরসীতে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার নবুয়ত প্রচার	৭	হযরতের শৈশব	৫৬
বিশ্ব-ধরাকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবযোগ্য করার ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন	৭	হযরতের মাতৃবিয়োগ	৫৭
পূর্বর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশ	৮	উম্মে আয়মান	৫৮
পূর্বাপর সকল মানুষ, জিন ও ফেরেশতাগণের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	১০	দাদাকেও হারাইলেন নবীজী (সঃ)	৫৯
নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	১১	নবীজীর মাতা-পিতা সম্পর্কে	৫৯
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে হযরতের বয়ান	১৩	বাল্যকালে নবীজীর বিদেশ সফর	৬০
প্রতীক্ষিত রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	১৪	সামাজিক ও কল্যাণ কাজে হযরতের প্রথম যোগদান	৬২
নিখিল সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	১৬	দেশবরেণ্যরূপে হযরতের খেতাবলাভ	৬৪
মাহবুবে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	১৬	হযরতের শিক্ষা ও ট্রেনিংদান	৬৪
হযরতের প্রতি দরূদের ফযীলত	১৭	সিরিয়া সফরে হযরত (সঃ)	৬৮
আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে রাজকীয় সম্মান মর্যাদা প্রদান	১৮	বিবি খাদীজার সহিত হযরতের শাদী মোবারক	৬৯
হযরতের আবির্ভাব	১৯	শাদী মোবারকের পর	৭৫
সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব	২০	হযরতের পোষ্যপুত্র	৭৬
হযরতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্বাচন	২৫	শেরেক বর্জন ও তওহিদ অন্বেষণে নবীজী (সঃ)	৭৮
হযরতের জন্য সর্বোত্তম বংশ নির্বাচন	২৬	সামাজিক সালিসীতে হযরত (সঃ)	৮০
হযরতের সময়কাল	২৬	সত্যের প্রথম প্রকাশ নবুয়তের প্রারম্ভ	৮৩
হযরতের পবিত্র নসব বা বংশ-পরিচয়	২৭	সর্বপ্রথম ওহী	৮৭
হযরতের রক্তধারায় আবদিয়াত	২৮	প্রথম প্রকাশের পর	৯০
হযরতের পিতা আবদুল্লাহর কোরবানী	৩০	সত্য প্রচারের আদেশ	৯২
হযরতের বংশ সম্পর্ক মদীনার সহিত	৩২	সর্বপ্রথম ফরয নামায	৯৪
হযরতের শাখাগোত্র বনু হাশেমের বৈশিষ্ট্য	৩৩	সর্বপ্রথম মুসলমান বিবি খাদীজা (রাঃ)	৯৫
হযরতের মাতুল	৩৩	দ্বিতীয় মুসলমান আলী (রাঃ)	৯৫
হযরতের পিতৃবিয়োগ	৩৪	তৃতীয় মুসলমান যায়েদ (রাঃ)	৯৬
সত্যের প্রাধান্য দ্বারা হযরতের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা	৩৪	চতুর্থ মুসলমান আবু বকর (রাঃ)	৯৬
বেলাদত বা শুভজন্ম	৩৬	নবুয়তের তৃতীয় বৎসর	৯৭
হযরতের জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলী	৩৮	প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার	৯৭
		নবুয়তের চতুর্থ বৎসর	১০২
		মোশরেকদের শত্রুতার ঝড়	১০২
		আবু তালেবের সহিত প্রথম বৈঠক	১০৩
		আবু তালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক	১০৪
		আবু তালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠক	১০৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবীজী (সঃ)-এর সহিত কোরায়শদের সরাসরি কথাবার্তা-প্রলোভনদান	১০৬
সরাসরি নবী (সঃ)-কে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস	১০৮
ইহুদীদের সহিত কোরায়শদের যোগাযোগ	১১০
আপস প্রচেষ্টা	১১১
নির্যাতনের তুফান আরম্ভ হইয়া গেল	১১১
সায়্যেদুনা বেলাল (রাঃ)	১১২
খাব্বাব (রাঃ)	১১৩
আম্মার পরিবার	১১৩
আবু ফোকায়হা ইয়াসার (রাঃ)	১১৪
বনীরাহ (রাঃ)	১১৪
পরীক্ষার ফল	১১৫
সম্ভ্রান্তগণের উপর অত্যাচার	১১৬
আবু তালেব কর্তৃক হযরতকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ	১১৮
নবুয়তের পঞ্চম বৎসর আবিসিনিয়ায় হিজরত	১১৯
মক্কাবাসীদের মুসলমান হইয়া যাওয়ার গুজব	১১৯
নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মুসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ	১২০
আবু বকরের আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি	১২৫
আবিসিনিয়ায় ইসলামের প্রভাব	১২৬
আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের ফযীলত	১২৭
হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	১২৯
ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	১২৯
নবুয়তের সপ্তম বৎসর হযরতের বিরুদ্ধে মোশরকেরদের বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলন	১৩৩
নবুয়তের দশম বৎসর অসহযোগিতা ও বয়কট ভঙ্গের এবং হযরতের "শোকের বৎসর"	১৩৫
রোকানা পাহলোয়ানের ইসলাম গ্রহণ	১৩৭
সত্যের গতি অপ্রতিহত	১৩৮
তোফায়েল দওসীর ইসলাম গ্রহণ	১৩৮
গুণীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণ	১৪০
আবু যর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ	১৪০
আবু তালেবের মৃত্যু	১৪৩
আবু তালেবের সর্বশেষ অবস্থা	১৪৩
খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু	১৪৭
আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ	১৪৯
তায়েফের সফর	১৫১
সাধনার ফল ধারণা বহির্ভূত আল্লাহর রহমত আসে	১৫৬
তায়েফ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন	১৫৮
বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় নবীজী (সঃ)-এর তৎপরতা	১৫৯
ইসলাম মদীনা পানে	১৬১
নবুয়তের একাদশ বৎসর ঐতিহাসিক বায়আ'তে আকাবা	১৬৫
বায়আ'তে আকাবা	১৬৬
মদীনায় প্রথম মোহাজের	১৬৯
মদীনায় ইসলামের প্রভাব	১৬৯
একটি গোটা বংশের ইসলাম গ্রহণ	১৭০
নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর আকাবায় বিশেষ সম্মেলন	১৭২
পুণ্যবান ও পুণ্যবতী	১৭৪
মদীনার প্রতিনিধি দল	১৭৫
সম্মেলন সমাপ্তে	১৮১
তরুণদের একটি মজার কাণ্ড	১৮২
মদীনায় ইসলামের কৃতকার্যতার কারণ	১৮৩
মদীনায় ইসলামের দুইটি বৎসর	১৮৫
নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর	১৮৬
ওমর (রাঃ) মদীনা পানে	১৮৭
আইয়্যাশ (রাঃ) বিপদে পড়িলেন	১৮৭
আইয়্যাশ (রাঃ)-এর মুক্তিলাভ	১৮৯
আনসারগণের সৌজন্য	১৯০
নবীজী (সঃ)-এর হিজরত	১৯০
হিজরতের সূচনা	১৯১
নবীজী (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) সওর পর্বতে	১৯৫
গিরি-গুহায় আবু বকর ও নবীজী (সঃ)	১৯৫
গিরি-গুহায় অসীম সাহসের পরিচয়	১৯৭
গিরি-গুহায় আল্লাহ তাআলার সাহায্য	১৯৯
গিরি-গুহায় পানাহারের ব্যবস্থা	২০০
কোরায়শদের খবরাখবর গুহায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা	২০০
যানবাহনের ব্যবস্থা	২০১
গিরি-গুহা হইতে মদীনা পানে	২০১
হিজরত প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ	২০২
নবী (সঃ)-এর একটি মহান আদর্শ	২০২
আবু বকর (রাঃ)-এর সদা সতর্কতা	২০৬
মদীনার পথে বিপদ	২০৬
সোরাকা ইবনে মালেকের ইসলাম গ্রহণ	২০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আরও এক দস্যু দলের আক্রমণ	২১০	হিজরী তৃতীয় বৎসর	২৪৯
মদীনার পথে খাদ্যের ব্যবস্থা	২১১	" চতুর্থ বৎসর	২৫০
উম্মে মা'বাদের কুটিরে নবীজীর কাফেলা	২১২	" পঞ্চম বৎসর	২৫০
ঐরূপ আরও একটি ঘটনা	২১৫	" ষষ্ঠ বৎসর	২৫২
আরও একটি ঘটনা	২১৬	" সপ্তম বৎসর	২৫৪
নূতন শুভ্র বসনে মদীনায় উপস্থিতির ব্যবস্থা	২১৭	হিজরী অষ্টম বৎসর	২৬১
মদীনার শহরতলীতে নবীজীর (সঃ) উপস্থিতি	২১৭	নবীজীর উদারতা	২৬১
কোবা পল্লীতে মসজিদ নির্মাণ	২১৯	হিজরী নবম বৎসর	২৬২
কোবা মসজিদের ফযীলত	২১৯	মসজিদে জেরার	২৬৫
মদীনার শহর পানে কোবা হইতে প্রস্থান	২২০	চতুর্দিক হইতে ইসলামের জয়	২৬৬
নীবী (সঃ)-এর সর্বপ্রথম জুমার খোতবা	২২০	স্বাধীন মক্কায় মুসলমানদের প্রথম হজ্জ	২৭১
জুমা শেষে নগরীর দিকে যাত্রা	২২২	হিজরী দশম বৎসর	২৭৪
মদীনা নগরে নবীজী (সঃ)	২২৩	মুসলমানদের পরম আনন্দ ও ইসলামের	২৭৪
কোবা পল্লী সম্পর্কীয় ঘটনাবলী	২২৪	চরম গৌরবের বৎসর	২৭৬
আবু আইউব (রাঃ)-এর গৃহে নবীজী (সঃ)	২২৭	বিদায় হজ্জ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন	২৭৬
নবীজী (সঃ)-এর পদার্পণে মদীনা	২২৮	হিজরী একাদশ বৎসর	
মদীনার সওগাত আরবী কাসীদা	২২৯	নবী (সঃ)-এর মহপ্রয়াণ এবং উম্মতের	
নবীজীর আগমনে মদীনাবাসীদের উল্লাস	২৩১	মহাশোক	২৭৬
হিজরতের গুরুত্ব	২৩১	নবীজীকে ইহজগত ত্যাগের সংকেত দান	২৭৭
হিজরী প্রথম বৎসর	২৩২	বিদায়ের সংকেত প্রাপ্তে নবীজী (সঃ)-এর	
আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণ	২৩২	অবস্থা	২৭৯
হযরতের নিকট ইহুদী আলেমগণের উপস্থিতি	২৩৪	গাদীরে খোমে ভাষণ	২৮০
মসজিদে নববী নির্মাণ	২৩৪	নবীজী (সঃ)-এর পীড়ার সূচনা	২৮৩
তৎকালীন মসজিদে নববী	২৩৬	রোগের প্রথম প্রকাশ	২৮৪
নবীজী (সঃ)-এর আবাসিক গৃহ তৈয়ার	২৩৭	নবীজী (সঃ)-এর অন্তিম রোগ	২৮৪
মক্কা হইতে নবীজী (সঃ)-এর পরিবারবর্গ		নবীজী (সঃ)-এর শেষ অবস্থা	২৮৫
আনয়ন	২৩৭	পরকালীন জিন্দেগীকে অগ্রগণ্যতা দান	২৮৫
মদীনায় নবীজী (সঃ) কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার		শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চারি দিন পূর্বে	২৮৬
গোড়াপত্তন	২৩৮	শেষ নিঃশ্বাসের এক বা দুই দিন পূর্বে	২৯০
আনসার মোহাজের ও ইহুদীদের মধ্যে		ফাতেমা (রাঃ)-এর সহিত গোপন আলাপ	২৯১
সহঅবস্থান চুক্তির ঐতিহাসিক সনদপত্র	২৩৮	শাহাদাতের মর্তবা লাভ	২৯২
আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন	২৪০	জীবনের সর্বশেষ দিন	২৯২
আনসারগণের চরম সহানুভূতি	২৪১	জীবনের শেষ মুহূর্ত	২৯৪
আত্মনির্ভরশীলতায় মোহাজেরগণের দৃঢ়তা	২৪২	জীবন সায়াহ্নে কতিপয় বাণী	২৯৬
আয়েশা (রাঃ)-কে গৃহে আনয়ন	২৪২	নবীজী (সঃ)-এর সর্বশেষ বচন	২৯৭
আযানের প্রবর্তন	২৪২	অন্তিম শয্যায় নবীজীর বিভিন্ন ভাষণ	২৯৭
মদীনায় ইসলামের নবরূপ	২৪৩	তুলনাহীন আদর্শের একটি ভাষণ	২৯৯
হিজরী প্রথম বর্ষ	২৪৭	আর একটি ভাষণ	৩০১
হিজরী দ্বিতীয় বৎসর	২৪৭	রসূলগণের সর্দার সমীপে করুণা ভিক্ষা	৩০২
কেবলা পরিবর্তন	২৪৭	শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ও তারিখ	৩০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর	৩০৭
হযরতের দেহ মোবারকের বিদায়	৩০৯
হযরতের পরিত্যক্ত সম্পদ	৩১০
এক নজরে নবীজী (সঃ)-এর তিরোধান	৩১৬
নবীজী (সঃ)-এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হযরতের দৈহিক অঙ্গ-সৌষ্ঠব	৩২৬
হযরত (সঃ)-এর চরিত্র গুণ	৩২৮
হযরত (সঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস	৩৩০
হযরতের সরল অনাড়ম্বর জিন্দেগী	৩৩০
নবীজীর চাল-চলন	৩৩২
নবীজীর চারিত্রিক গুণাবলী	৩৩৩
নবুয়তের প্রমাণ তথা হযরতের মো'জেযার বয়ান	৩৩৪
হযরত (সঃ) কর্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা	৩৩৮
চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার মো'জেযা	৩৪০
এই মো'জেযার সময়কাল	৩৪৩
হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা	৩৪৩
মে'রাজ শরীফের বয়ান	৩৪৬
মে'রাজ শরীফের তাৎপর্য	৩৪৭
মে'রাজে রসূলের মোলাকাত	৩৪৯
মে'রাজ শরীফের তারিখ	৩৫০
মে'রাজের বিবরণ	৩৫০
বায়তুল মোকাদ্দাসে উপস্থিতি	৩৫৭
মে'রাজ উপলক্ষে হযরত (সঃ) কি কি পরিদর্শন করিয়াছেন	৩৫৮
হাউজে কাওসার	৩৫৮
পরজগতের বস্তুনিচয়	৩৫৯
গীবত বা পরনিন্দার আজাব	৩৫৯
আমলহীন ওয়ায়েজ বা বক্তার আজাব	৩৬০
সুদখোরের আযাব	৩৬০
বিভিন্ন গোনাহের আযাব	৩৬১
কর্জে হাসানার সওয়াব	৩৬১
বিভিন্ন কার্যের পরিণাম	২৬২
আল্লাহকে দেখিয়াছিলেন কি?	৩৬৩
এই ভ্রমণে ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ	৩৬৪
মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় হইয়াছিল	৩৬৫
মে'রাজের প্রতিরূপ বা স্বরূপ প্রদর্শন	৩৬৬
মে'রাজের ঘটনা বাস্তব হওয়ার প্রমাণ	৩৬৮
সিনা চাক বা বক্ষ বিদীর্ণ করা	

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত (সঃ) সর্বশেষ নবী	৩৭০
রহমাতুল-লিল-আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	৩৭৩
কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থা দানে রহমাতুল-লিল-আলামীন	৩৭৩
কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ ব্যবস্থা দানে রহমাতুল-লিল- আলামীন	৩৮০
মাতৃজাতি সম্পর্কে নবীজী (সঃ)	৩৮১
প্রতিবেশী সম্পর্কে নবীজী (সঃ)	৩৮৪
এতীম সম্পর্কে নবীজী (সঃ)	৩৮৪
দানশীলতায় নবী (সঃ)	৩৮৪
আতিথেয়তায় নবী (সঃ)	৩৮৪
ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা	৩৮৫
শ্রমের মর্যাদা দান	৩৮৫
স্বভাবগত সংসারী জীবনের শিক্ষাদান	৩৮৬
অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আদর্শ	৩৮৬
কল্যাণ ও মঙ্গলময় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা	
শিক্ষাদানে রহমাতুল লিল আলামীন	৩৮৭
পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠুতার তাগিদ	৩৮৯
ব্যক্তিগত জীবনে রহমাতুল লিল আলামীন	৩৮৯
ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা	৩৮৯
দয়ার দরিয়া নবীজী (সঃ)	৩৯২
শত্রুর প্রতি দয়া	৩৯২
শিশুদের প্রতি নবী (সঃ)	৩৯৩
কৃচ্ছ জীবন যাপন শিক্ষাদানে নবীজী (সঃ)	৩৯৩
সাধারণভাবে নবীজী (সঃ)	৩৯৮
আদর্শ নেতৃত্ব শিক্ষাদানে নবীজী (সঃ)	৩৯৪
দৈনন্দিন অবস্থায় নবীজী (সঃ)	৩৯৫
উম্মতের সমবেদনায় নবীজী (সঃ)	৩৯৭
রহমাতুল-লিল-আলামীনের মূল তাৎপর্য	৩৯৮
মদীনার আকর্ষণে একটি কাসীদা	৩৯৯

সূচি সমাপ্ত

জ্ঞাতব্য ও সতর্কবাণী

মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফের অনুবাদ তথা বাংলা বোখারী শরীফের পঞ্চম খন্ড সীরাতুন নবী সঙ্কলনরূপে প্রকাশ করা হইল। মূল বোখারী শরীফে এই শিরোনামার কোন অধ্যায় নাই, এমনকি "নবী কাহিনী" যে অধ্যায় আছে তাহার অংশরূপেও নহে। তবে এই সঙ্কলনের এক মৌলিক পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে রহিয়াছে। যথা– ৫০০ হইতে ৫১৩, ৫৪৩ হইতে ৫৬১ এবং ৬২৬ হইতে ৬৪১ পর্যন্ত পৃষ্ঠাসমূহে তাহার বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বিক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত বিষয়ে বোখারী শরীফের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে।

নবী কাহিনী অধ্যায়ের অনুবাদ চতুর্থ খণ্ড লেখার পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আলোচনার প্রতি মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। মূল গ্রন্থের উল্লিখিত পৃষ্ঠাসমূহ তাহাতে অধিক উৎসাহ যোগাইল। কারণ, ঐ পৃষ্ঠাগুলির বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদসমূহ অনুবাদ করিলে উল্লিখিত প্রিয় আলোচনার বিরাট অংশ তাহাতে আসে। তাই অন্তরে আবেগ জন্মিল ক্রমিকবিহীন পৃষ্ঠাগুলি হইতে প্রিয় আলোচনার পরিচ্ছেদসমূহ ভিন্ন করিয়া একত্রে বিন্যস্তরূপে অনুবাদ করার।

এর সঙ্গে আর একটি দুঃসাহসের প্রতিও মন আকৃষ্ট হইল যে, নবীজী (সঃ)-এর ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত আলোচনা– যাহা পূর্বাপর সীরাত সঙ্কলকগণ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা। ইহা করিতে যাইয়া বহু পরিচ্ছেদ ও বিষয় এমনও আলোচিত হইয়াছে যাহার উল্লেখ মূল বোখারী শরীফে নাই, এমনকি সে সম্পর্কে কোন হাদীছও বোখারী শরীফে নাই; অন্যান্য কিতাবে তাহার আলোচনা রহিয়াছে। নবীজী (সঃ)-এর মোবারক আলোচনাকে যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের মানসে আমি তাহা করিয়াছি। তাই একটি বিভ্রাট সৃষ্টির অভিযোগে আমি অপরাধী।

পবিত্র কোরআনের পরে বোখারী শরীফ সর্বোচ্চ; সাধারণ গ্রন্থাবলী বা তাহাতে বর্ণিত সব হাদীছ বোখারীর মর্যাদার নহে। সুতরাং আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি–

এই সঙ্কলনে মূল বোখারী শরীফের অতিরিক্ত যেসব বিষয় বা হাদীছ রহিয়াছে, যাচাই ছাড়া তাহার প্রামাণিকতা বোখারী শরীফের তুল্য নহে। অবশ্য প্রত্যেকটির প্রমাণ সঙ্গে রহিয়াছে।

যথাসাধ্য পার্থক্যের জন্য আমি একটি নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি। যে সমস্ত পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে আছে তাহা পৃষ্ঠা-নম্বরসহ বড় অক্ষরে রহিয়াছে। তদ্রূপ যেসব হাদীছ মূল বোখারী শরীফ হইতে অনূদিত, তাহার উপর ক্রমিক নম্বর রহিয়াছে। ক্রমিক নম্বরবিহীন যেসব হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে তাহা বোখারী শরীফের নহে।

—আজিজুল হক

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . وَالصَّلٰوةُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার।

وَ السَّلَامُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

দরূদ এবং সালাম সমস্ত নবী ও রসূলগণের প্রতি

خُصُوْصًا عَلٰى سَيِّدِهِمْ وَاَفْضَلِهِمْ نَبِيِّنَا

বিশেষত ঃ নবী ও রসূলগণের সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি- যিনি আমাদের নবী এবং

خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ . وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সর্বশেষ নবী - তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহাদের যত খাঁটি ও পূর্ণ অনুসারী হইবেন তাঁহাদের প্রতি।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী দলভুক্ত বানাইবেন নিজ কৃপাবলে, হে দয়াময়, সর্বাধিক দয়ালু!

اٰمِيْن ! اٰمِيْن !! اٰمِيْن

আমীন ! আমীন!! আমীন।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ

كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ

বালাগাল উলা বিকামালিহী

কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ

হাসুনাত জামীউ খেছালিহী

ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ

بَلْ هُوَ يَاقُوْتَةٌ وَالنَّاسُ كَالْحَجَرِ

মুহাম্মাদুন বাশারুন লা কালবাশার্

বাল হুওয়া ইয়াকুতাতুন ওয়ান্নাসু কাল্ হাজার্

لَايُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَاكَانَ حَقُّهٗ

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

লা- ইউমকিনুস সানাউ কামা কানা হাক্কুহ

বা'দায খোদা বুযুর্গ তুয়ী কিচ্ছা মোখ্তাসার

সর্বোচ্চ শিখরে তিনি নিজ মহিমায়

কাটিল তিমির রাশি তাঁর রূপের আভায়

চরিত্র মাধুরী তাঁহার অতি মনোরম

তাঁহার 'পরে ও বংশ' পরে দরূদ ও সালাম

মুহাম্মদ মানুষ তবে যেমন মানুষ নন

পাথর মাঝে পরশমণি গণ্য তিনি হন

গরিমা তাঁহার বর্ণিবে কেউ এমন সাধ্য নাই

খোদার পরেই শ্রেষ্ঠ তিনি তুলনা তাঁহার নাই

সর্বপ্রথম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

অনাদিরূপে এক আল্লাহ তাআলাই ছিলেন– অন্য কিছু বলিতে আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই– এই শূন্যতার সমাপ্তি ঘটাইতে ইচ্ছা করিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা।

যেমন– ওলীকুল শিরোমণি শায়খ মহিউদ্দীন ইবনে আরবী শায়খে আকবর (রঃ) কর্তৃক এলহামে প্রাপ্ত এবং পূর্বাপর ওলী ও সূফী তথা আধ্যাত্মিকতায় ধৈন্য মহানগণ কর্তৃক গৃহীত আল্লাহ তাআলার একটি বাণীতে উল্লেখ আছে–

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَرَدْتُّ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ـ

"আমার সত্তা (জানিবার কেহ না থাকায়) অজানা ছিল; আমার ইচ্ছা হইল (আমার গুণাবলীর মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ করা)– আমাকে জানান। সেমতে আমি সৃষ্টি করি জগত।" (তফসীর রুহুল মাআনী পৃঃ ১৪–২১)

এই বাণীর মর্ম কোরআনের একটি আয়াত দ্বারাও সমর্থিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

مَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ـ

"জিন এবং মানুষ এই দুইটি জাতিকে আমি একমাত্র আমার এবাদত বা গোলামী করার উদ্দেশে সৃষ্টি করিয়াছি।".

আল্লাহকে জানা ব্যতিরেকে আল্লাহর গোলামী হইতে পারে না। আর আল্লাহকে জানা এবং আল্লাহর মা'রেফত তথা আল্লাহর গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করা– ইহার সাথে আল্লাহর এবাদত-গোলামী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব প্রথম বাণীটির এবং এই আয়াতের মর্ম নিতান্তই অভিন্ন।

নিজকে জানান, নিজের গোলামী করান– আল্লাহ তাআলার এই ইচ্ছার বাস্তবায়নে জগত সৃষ্টির শুভ প্রারম্ভেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সৃষ্টি-মূল নূরকে। এই নূরকেই পরিভাষায় বলা হইয়া থাকে "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া"। (যোরকানী, ১–২৭)

এই নূর বা হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বলিতে কাহারও মতে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র রূহ বা আত্মা উদ্দেশ্য। আর কাহারও মতে অন্য কোন বাস্তব বস্তুবিশেষ উদ্দেশ্য (যোরকানী ১–৩৭)। অথবা ঐ পবিত্র রূহ বা আত্মারই বাহন, কিন্তু পদার্থীয় দেহ নহে, বরং হয়ত এক বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব– যাহার প্রতিবিম্বের বিকাশ ছিল হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জাগতিক নশ্বর দেহ।*

এই হাকীকতে মুহাম্মদিয়াই হইল নিখিল সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি। লৌহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতা এবং মানব-দানব সব কিছুই ঐ হাকীকতে মুহাম্মদিয়া বা নূরে মুহাম্মদীর পরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই তথ্য সুস্পষ্টরূপে বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ

* প্রথম খণ্ড "কবরের আযাব" পরিচ্ছেদে জেসমে মেসালী বা জ্যোতির্দেহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই ঐ দেহ আছে; ঐ শ্রেণীর কোন বাহন হওয়া বিচিত্র নহে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁহার সীরাত সঙ্কলন 'নশ্‌রুত্তীব' কিতাবে নিজ সংযোজিত টীকায় নূরে মুহাম্মদীকে রূহে মুহাম্মদী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّىٌّ وَلَا اِنْسِىٌّ (رواه عبد الرزاق)

অথ ঃ "জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক; সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কোন্ জিনিসটি সৃষ্টি করিয়াছেন? রসূল (সঃ) বলিলেন, হে জাবের! আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদর নবীর নূর সৃষ্টি করিয়াছেন (যাহা) আল্লাহর (বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট) নূর হইতে। অতঃপর সেই নূর আল্লাহর কুদরতে আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলমান ছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান- যমীন, চন্দ্র-সূর্য, মানব-দানব এবং ফেরেশতা কিছুই ছিল না।"

(যোরকানী, ১-৪৬)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন যোগ্যতায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সকলের ঊর্ধ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন

উপরোল্লিখিত আল্লাহ প্রদত্ত এলহামী বাণী ও তাহার সমর্থনে আয়াতের মর্ম ইহাই ছিল যে, "আল্লাহকে জানিবে, আল্লাহর গোলামী করিবে এই উদ্দেশেই সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি।" সুতরাং সাধারণ নিয়ম মতেই আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রথম সৃষ্টি হযরত মুহামদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ঐ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের যোগ্যতায় সকলের ঊর্ধ্বে শীর্ষস্থানের অধিকারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বোখারী শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে, নবী (সঃ) ফরমাইয়াছেন-

اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا ـ

"আল্লাহকে ভয় করায় এবং আল্লাহকে জানায় আমি তোমাদের তথা নিখিল সৃষ্টির সকলের ঊর্ধ্বে।" আল্লাহকে যে যত বেশী ভয় করিবে, সে তাঁহার তত বেশী গোলামী করিবে।

আল্লাহকে জানা তথা আল্লাহর মা'রেফতের আধার এবং আল্লাহর গোলামীর প্রকৃষ্ট নমুনারূপে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তথা তাঁহার মূল সত্তা সকল সৃষ্টির আগে সৃষ্টি করিয়া মূলতঃ ইহাই প্রতীয়মান করিয়াছেন যে, আল্লাহর মা'রেফতের ধারা এই আধার হইতেই প্রবাহিত হইবে। নিখিল সৃষ্টি সেই প্রবাহের ধারা হইতেই আল্লাহর মা'রেফত লাভ করিবে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর মা'রেফতের দ্বারা লাভে ধৈন্য হওয়া একমাত্র সেই আধারের সংযোগেই সম্ভব। সেই আধারের সংযোগ ব্যতিরেকে কোন সৃষ্টিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আল্লাহকে সঠিকরূপে জানায় ধন্য হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে সঠিকরূপে জানা হইতে যাহারা বঞ্চিত, তাহারা বস্তুত সৃষ্টির উদ্দেশ্য বানচালকারী। তাহারা পরকালে জাগতিক জীবনের কর্মভোগ স্থলে সৃষ্টিকর্তার করুণাভাজন হইয়া তাঁহার পুরস্কার লাভে ধন্য হওয়ার যোগ্য হইতে পারে না, তাহাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ-কেন্দ্র নরক অবধারিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তাই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সংযোগ ছাড়া পরকালের মুক্তি লাভ হইবে না।

তদ্রূপ আল্লাহর গোলামীর রূপরেখা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইতেই প্রকাশিত হইবে। কারণ, তিনিই স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আল্লাহর গোলামীর নির্ধারিত নমুনা।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ـ

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে (আল্লাহর গোলামী বাস্তবায়নের) সুন্দর নমুনা রাখা হইয়াছে ঐরূপ প্রত্যেকের জন্য, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকালের মুক্তির আশা রাখে।" (পারা- ২১; রুকু- ১৯)

অতএব তাঁহার আদর্শে ও তাঁহার শিক্ষানুযায়ী আল্লাহর গোলামী না করা হইলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং আখেরাতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, বিশ্ব-বুকে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের পরে ত তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণপূর্বক তাঁহার সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে, অবশ্য তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে অন্যান্য নবীগণের উম্মত হইয়া সেই নবীর মাধ্যমে উক্ত সংযোগ স্থাপিত হইত। সম্মুখের একটি শিরোনামে প্রতীয়মান হইবে যে, নবীগণের সকলের নবুয়তের উৎসই নবী মুহাম্মদ (সঃ)।

সৃষ্ট জগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্নরূপে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে সৃষ্টির সূচনা করিয়া আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সর্বাধিক প্রিয় এবং ভালবাসার ও আদরের পাত্র বানাইয়াছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র

কোন শিল্পী নিজ দক্ষতায় সুন্দর গঠনের একটি জিনিস তৈয়ার করে; তাহা এতই সুন্দর হয় যে, স্বয়ং গঠনকারী শিল্পী তাহারই হাতে গঠিত জিনিসটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, সে তাহাকে আদর করে, ভালবাসে।

তদ্রূপ মহান আল্লাহ হাকীকতে মুহাম্মদিয়াকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন, তাহাকে ভালবাসেন, সর্বাধিক আদরের পাত্র বানাইয়া নেন।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন-

اِنِّىْ قَائِل قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى صَفِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "আমি একটি কথা বলিতেছি; ফখর বা গর্ব করা উদ্দেশ্য নহে। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন), মূসা সফিউল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহ কর্তৃক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত), আর আমি হাবীবুল্লাহ (অর্থাৎ আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তাঁহার দোস্ত বানাইয়াছেন- ভালবাসিয়াছেন)। -(মেশকাত শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মাহবুব, সর্বাধিক প্রিয়- এই সত্যের প্রকাশ ভঙ্গিমায় পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত লক্ষণীয়-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ـ

অর্থ ঃ "আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাকে ভালবাস- ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাও তবে আমার অনুসরণ তোমাদের করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে (শুধু ইহাই প্রতিপন্ন হইবে না যে, তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, বরং) আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তোমাদেরকে ভালবাসিবেন।" (পারা-৩, রুকু-১২)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে দোস্ত বানাইয়াছেন; আল্লাহ তাঁহাকে ভালবাসেন- তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা এতই প্রগাঢ় যে, তাঁহার অনুসারীকেও আল্লাহ তাআলা ভালবাসিয়া থাকেন- স্বীয় হাবীব গণ্য করেন।

অন্য আয়াতে আছে مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যেব্যক্তি আল্লাহর রসূলের তাবেদারী করিবে সে আল্লাহর তাবেদার সাব্যস্ত হইবে।"(পারা-৫, রুকু-৮)

নিখিল সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিকাশ সাধন

শিল্পীর নিজ হাতে গড়া বস্তু তাহার দক্ষতায় এতই সুন্দর ও মনোরম হয় যে, স্বয়ং শিল্পী তাহার ভালবাসায় মুগ্ধ হয়। এমনকি শিল্পী প্রদর্শনী করিয়া তাহার গুণ-গরিমার প্রচার-প্রসার করে। আল্লাহ তাআলাও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষেত্রে তাহাই করিয়াছেন।

আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর গোলামী করা- ইহার যোগ্যতা ও গুণ, বৈশিষ্ট্য দানে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে (তাঁহার মূল সত্তা হাকীকতে মুহাম্মদিয়া) সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে চরম ভালবাসা ও আদরের উচ্চ মর্যাদায় ধন্য করিয়া তাঁহার প্রদর্শনীর ইচ্ছা করিলেন। প্রদর্শনীর মাধ্যমেই তাঁহার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য-গুণের প্রচার ও প্রসার হইবে এবং সৃষ্ট-জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হইবে।

আল্লাহকে চেনা তথা তাঁহার অসীম গুণাবলীর মারফতে তথা অনুধাবনে ধাপে ধাপে উর্ধ্বের উর্ধ্বে পৌছা এবং আল্লাহর গোলামী বা এবাদতের অসংখ্য স্তর ধীরে ধীরে আয়ত্ত করা- ইহার একমাত্র পাত্র মানুষ ও জিন জাতিদ্বয়। এই জাতিদ্বয়ের জীবন যাপনের জন্য ইহজগতের সমুদয় সৃষ্টির প্রয়োজন। এই জাতিদ্বয় তাহাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে চেনা ও আল্লাহর গোলামী করা- এই দায়িত্ব পালন করিলে পুরস্কার লাভের জন্য বেহেশত এবং পালন না করিলে শাস্তির জন্য দোযখ তথা পরজগতের সব কিছু সৃষ্টির প্রয়োজন।

সৃষ্ট জগত সৃষ্টির মূল উদ্দেশের কেন্দ্ররূপে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মূল সত্তা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ তাআলা তাহার প্রদর্শনীর জন্য উল্লিখিত ধারা পরম্পরায় ইহজগত ও পরজগতসহ কুল-মখলুকাত তথা অসংখ্য অগণিত চিজ-বস্তু সৃষ্টি করিলেন। এই তথ্যের ইঙ্গিতই নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে উল্লেখ হইয়াছে।

হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হইতে বর্ণিত আছে-

اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عِيْسٰى اٰمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَمُرْ اُمَّتَكَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِهٖ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ اٰدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ ـ (رواه الحاكم)

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস্ সালামের নিকট ওহী মারফত আদেশ পাঠাইয়াছিলেন, মুহাম্মদের প্রতি আপনি ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং স্বীয় উম্মতকে আদেশ করিবেন- তাহারা যেন (বর্তমানে আপনার মুখে শুনিয়া এবং পরবর্তীতে তাঁহার আবির্ভাব হইলে) তাঁহার প্রতি ঈমান আনে। মুহাম্মদ (-এর বিকাশ সাধন ইচ্ছা) না হইলে আদমকেই সৃষ্টি করিতাম না, বেহেশতও সৃষ্টি করিতাম না, দোযখও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১-৪৪)

হাদীছ ঃ সালমান ফারেসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اِنْ كُنْتَ اتَّخَذْتَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا ـ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ

الدُّنْيَا وَاَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِيْ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا ـ (رواه عساكر)

অর্থ ঃ "একদা জিব্রাঈল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক সংবাদ পাঠাইয়াছেন– ইহা সত্য যে, ইব্রাহীম আমাকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন, আমি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে স্বয়ং আমি দোস্ত বানাইয়াছি। আমার নিকট আপনার চেয়ে সম্মানী কোন কিছু আমি সৃষ্টি করি নাই। আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি– বিশ্ব এবং উহার সব কিছু আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই উদ্দেশে যে, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব আপনার গৌরব এবং আমার নিকট আপনার যে কত মর্যাদা। আপনার বিকাশ সাধনের ইচ্ছা না হইলে আমি বিশ্ব সৃষ্টি করিতাম না।"

(ইবনে আসাকের, ১–৬৩)

বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে উর্ধ্ব জগতে হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি

কাহাকেও কোন পদে নিযুক্তির তিনটি পর্যায় আছে– যেমন চাকুরীর জন্য– (১) বাছাই করা। (২) চাকুরী প্রদান করা। (৩) কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা। কোন সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় এক সঙ্গেই হয়, আর কোন সময় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইয়া থাকে।

সকল নবীরই নবুয়তের জন্য নির্বাচন ও বাছাই করা আদিকালে আল্লাহ তাআলার নিকট সম্পন্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শুধু প্রথম পর্যায়ের ছিল। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছাড়া অন্য সকল নবীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় একই সঙ্গে তাঁহাদের আবির্ভাবকালে সম্পন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং উহা তাঁহার জন্য এক অসাধারণ গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বেলায় তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান তাঁহার আবির্ভাবকালে হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বহু বহু পূর্বে, এমনকি সারা বিশ্ব ও বিশ্বের আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালামেরও সৃষ্টির পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছিল।* হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর এই বিশ্ব-ভুবন এবং হযরত আদমেরও সৃষ্টির পূর্বে উর্ধ্ব জগতে নবীরূপে বিঘোষিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এই একক বৈশিষ্ট্য নিম্ন হাদীছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ (رواه الترمذى فى سننه) ـ

অর্থ ঃ "ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ সময়ে নিশ্চিতরূপে আপনার নবুয়ত লাভ হইয়াছিল? রসূল (সঃ) বলিলেন, যে সময়ে আদম তাঁহার আত্মা ও দেহের সম্মিলনে পয়দাও হইয়াছিলেন না।" অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে। এই তথ্যটি আরও কতিপয় হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা– এরবাজ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এবং মায়সারা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে।

এই তথ্য "যোরকানী" ১–৩৮ এবং "নশরুত্তীব" ৬ পৃষ্ঠার টীকা হইতে গৃহীত। উক্ত টীকায় এই তথ্যটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত টীকাটি মূল কিতাবের সঙ্কলক মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহি আলাইহির নিজস্ব হওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে।

(যোরকানী, ১-৩১, ৩২)

আরশ কুরসীতে "মুহাম্মদ (সঃ)"-এর নাম এবং তাঁহার নবুওতের প্রচার

আদম সৃষ্টিরও পূর্বে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার নাম এবং তিনি যে আল্লাহ তাআলার রসূল তাহা ঊর্ধ্ব জগতের সর্বত্র বিঘোষিত হইতেছিল এবং মহান আরশের গায়ে তাঁহার নাম-পরিচয় এবং "রসূলুল্লাহ" খেতাব লিখিত ছিল। এই তথ্য একাধিক হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন-

হাদীছ ঃ ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন)-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اقْتَرَفَ اٰدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَارَبِّ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اِلاَّ مَا غَفَرْتَ لِىْ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاٰدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ اَخْلُقْهُ قَالَ يَا رَبِّ لاَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِىْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِىَّ مِنْ رُّوْحِكَ رَفَعْتُ رَاْسِىْ فَرَاَيْتُ عَلٰى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَعَلِمْتُ اَنَّكَ لَمْ تَضِفْ اِلٰى اسْمِكَ اِلاَّ اَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقْتَ يَاٰدَمُ اِنَّهٗ لاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَىَّ وَاِذَا سَاَلْتَنِىْ بِحَقِّهٖ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ (رواه البيهقى)

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম (আঃ) আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যে ভুল করার পর একদা তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এইরূপে দোয়া করিলেন- হে পরওয়ারদেগার! মুহাম্মদের উসিলা ধরিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদকে কিরূপে চিনিতে পারিয়াছ, অথচ এখনও আমি তাঁহার (প্রকাশ্য) দেহ তৈয়ার করি নাই? আদম (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! যখন আমাকে আপনার বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও আপনার সৃষ্ট আত্মা আমার ভিতরে প্রবেশ করাইয়াছেন তখন আমি মাথা উঠাইবা মাত্র আরশের পায়াসমূহে লেখা দেখিয়াছি- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূল্লাহ"। আমি তখন ভাবিয়াছি, আপনার সর্বাধিক ভালবাসার সৃষ্টি না হইলে আপনার নামের সহিত (এই নাম) জড়িত করিতেন না। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে আদম! তুমি সত্য বিষয়ই ভাবিয়াছ। নিশ্চয় মুহাম্মদ আমার সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। তুমি তাঁহার উসিলা ধরিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। মুহাম্মদের বিকাশ সাধন করার ইচ্ছা না হইলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১-৬২)

বিশ্ব-ধরাকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবযোগ্য করার ব্যবস্থায় তাঁহার নূরের আভা নিয়া পূর্ববর্তী নবীগণের আগমন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবযোগ্য বিশ্ব গঠনে জরুরী পর্যায়ে কতিপয় বিশেষ গুণ প্রতিভা প্রয়োজন- (১) সত্য গ্রহণে নির্ভীক অদম্য সাহসী হওয়া; যেন সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় সৎসাহসের মদদে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করায় নির্দ্বিধায় অগ্রসর হইতে পারে। (২) সত্যের উপর দৃঢ় থাকায় পর্বত অপেক্ষা অধিক অটল-অনড়

হওয়া, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ আঁকড়াইয়া থাকায় জুলুম-অত্যাচার, ঝড়-তুফান চুল পরিমাণও বিচ্যুত করিতে না পারে। (৩) সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বীরত্বের সহিত ত্যাগ তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গে অগ্রসর হইতে থাকা, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার-প্রতিষ্ঠিত করায় বিরোধী শক্তির বাধায় প্রতিহত হইতে না হয়। (৪) সত্যকে স্থায়ী করার চেষ্টা ও পরিকল্পনায় সচেতন, বিজ্ঞ সুকৌশলী হওয়া, যেন ঐ শিক্ষা ও আদর্শ বিশ্ব বুকে কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখায় বিরামহীন প্রচেষ্টা ও মেহনতে ব্রতী হইতে পারে।

এই শ্রেণীর গুণাবলী ও যোগ্যতার পরিবেশেই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব সার্থক হইতে পারে। মানব সমাজে ঐ শ্রেণীর গুণ ও যোগ্যতা আনয়ন উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার বা আরও বেশী নবী-রসূল এই ধরায় পাঠাইয়াছিলেন।

উল্লিখিত শ্রেণীর অসংখ্য গুণাবলী ও যোগ্যতার মূল আধার-আকর বানাইয়াছিলেন আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-কে এবং তাঁহার মূল সত্তা– নূর বা হাকীকতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে ঐ সমস্ত গুণের উৎস প্রোথিত ছিল। যেরূপে আল্লাহর কুদরতে ডিমের কুসুমে মোরগ-মুরগীর দেহের হাড়, গোশত চোখ, কান, ঠোঁট, নখ সবই প্রোথিত থাকে।

পূর্ববর্তী সকল নবী পরম্পরা বিশ্ব-বুকে আসিয়াছেন এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা ও মেহনত চালাইয়া মানব সমাজে ঐ গুণাবলী ও যোগ্যতা আনয়ন করায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদেরও মূল সম্বল উক্ত নূরেরই আভা ছিল।

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রশংসা ও অসাধারণ মান-মর্যাদা রচনায় ৮৫০-এর অধিক বৎসর পূর্বের একটি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য পুস্তিকা প্রচলিত আছে– "কাসীদাহ বোরদাহ"। উক্ত কবিতায় দুইটি পংক্তি এই আলোচনায় লক্ষণীয়–

وَكُلُّ اٰىٍ اَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا ۔ فَاِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُّوْرِهٖ بِهِمْ ۔

"সম্মানিত রসূলগণ যত বৈশিষ্ট্যের পাত্র ছিলেন– বস্তুতঃ তাঁহাদের মধ্যে ঐসব বৈশিষ্ট্য হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নূর হইতেই আসিয়াছিল।"

পরবর্তী পংক্তিতে উল্লিখিত সত্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত দানে বলা হইয়াছে–

فَاِنَّهٗ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا ۔ يُظْهِرْنَ اَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِىْ ظُلَمِ ۔

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইলেন সকল গুণের আধার– সূর্য, আর সকল নবী ঐ সূর্যকেন্দ্রিক নক্ষত্রসমূহ। ঘোর অন্ধকারে লোকদের জন্য নক্ষত্রসমূহ সূর্যেরই আলো প্রকাশ করে। (অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলো নক্ষত্র হইতে দেখা গেলেও বস্তুতঃ ঐ আলো সূর্য হইতে।)"

পূর্ববর্তী নবীগণের প্রচেষ্টায় মানব সমাজে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় ঐ গুণাবলী ও যোগ্যতা এবং উহার সর্বোত্তম যুগ দেখা দিলে সেই যুগে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব হয়। এই মর্মে বোখারী শরীফেরই একটি হাদীছ "সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব" শিরোনামে অনূদিত হইবে।

পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে নির্দেশ

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশেই আল্লাহ তাআলা এই বিশ্ব-ভুবন সৃষ্টি করিলেন। সেমতে এই

বসুন্ধরাকে হযরত (সঃ)-এর আবির্ভাব ক্ষেত্ররূপে উপযোগী করার উদ্দেশে ধাপে ধাপে উহাকে মার্জিত করার জন্য এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এই বিশ্বে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়াই সকল নবীর আগমন।

জাগতিক কার্য ব্যবস্থায় দেখা যায়– একটি দেশকে কেন্দ্র করিয়া তাহার প্রেসিডেন্ট, গভর্নর ও মন্ত্রী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়; সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ঐ দেশ ও উহার শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করা হয়। তদ্রূপ যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত নবী এই ধরায় আসিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মনোনয়ন বা নিয়োগ তথা আবির্ভাবলগ্নে তাঁহাদের প্রত্যেক হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহা পবিত্র কোরআন বর্ণিত সত্য–

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ

لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ .... قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ -

"**স্মরণীয় ঘটনা** ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, আপনাদেরকে কিতাব এবং শরীয়ত যাহাই দান করি তারপর আসিবে আপনাদের নিকট এক রসূল– যিনি আপনাদের নিকটস্থ কিতাবের বাস্তবতা প্রমাণকারী হইবেন; (যেহেতু তাঁহার আগমনের অগ্রিম সংবাদ আপনাদের কিতাবে থাকিবে, অতএব তাঁহার আগমন দ্বারা আপনাদের কিতাবের বাস্তবতা প্রমাণিত হইবে। তিনি আপনাদের বর্তমানে আসিয়া গেলে) আপনারা তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সাহায্য-সহায়তা করিবেন। (অঙ্গীকারের এই বিষয়বস্তু উল্লেখপূর্বক) আল্লাহ তাআলা নবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, আপনারা অঙ্গীকার করিলেন ত এবং উক্ত বিষয়-বস্তুর উপর আমার কঠোর আদেশ গ্রহণ করিলেন ত? নবীগণ সকলে বলিলেন, আমরা অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আপনারা (নিজেরাই নিজেদের উপর) সাক্ষী থাকুন; আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে থাকিলাম। (এই অঙ্গীকারে উম্মতগণও শামিল হইবে) এই অঙ্গীকারের পর যে ফিরিয়া যাইবে সে অন্যায়কারী গণ্য হইবে।"

(পারা– ৩; রুকু– ৬)

• উল্লিখিত আয়াতে সমস্ত রসূলগণ হইতে ঈমান ও সাহায্যের উক্ত কঠোর অঙ্গীকার যেই রসূল সম্পর্কে লওয়া হইয়াছিল তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তফসীরে জালালাইন ও বিভিন্ন তফসীরে ইহা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

• উল্লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল আলমে আরওয়াহ বা আত্মার জগতে। যেখানে ইহজগতের ভাবী মানবগুষ্ঠি সকল হইতে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণের অনুষ্ঠান হইয়াছিল– যাহার সুস্পষ্ট আলোচনা সূরা আ'রাফ ১৭ নং আয়াতে রহিয়াছে।

অথবা প্রত্যেক নবী হইতে তাঁহার আবির্ভাবকালে ওহী মারফত ঐ অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল।

(বয়ানুল কোরআন)

নবীগণের এই অঙ্গীকার তাঁহাদের নিজ নিজ উম্মতের উপর অবশ্যই কঠোরভাবে বর্তিবে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মত হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেনও বটে।

পূর্ববর্তী নবীগণ হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণের বিষয়টি আলী (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই–

لَمْ يَبْعَثِ اللّٰهُ نَبِيًّا مِّنْ اٰدَمَ فَمَنْ بَعْدَهٗ اِلَّا اَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ وَيَأْخُذُ الْعَهْدَ بِذَٰلِكَ عَلٰى قَوْمِهِ

(رواه ابن كثير فى تفسيره وابن عساكر)

অর্থ ঃ "আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী যত নবীকে ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি ধরাপৃষ্ঠে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তবে তিনি স্বয়ং অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিবেন এবং তাহার সমর্থন সহায়তা করিয়া চলিবেন। আর প্রত্যেক নবীও স্বীয় উম্মত হইতে মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে ঐরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতেন।

(যোরকানী, ১-৪০)

এই জন্যই ত রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন–

لَوْ كَانَ مُوسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ اِلاَّ اِتِّبَاعِىْ -

অর্থ ঃ "এই যুগে মূসা পয়গম্বর জীবিত থাকিলে তাঁহার জন্য আমার আনুগত্য-অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকিত না।" (মেশকাত শরীফ)।

"মাওয়াহেবে লুদুনিয়্যাহ্" কিতাবে উক্ত তথ্য বর্ণনার পর উল্লেখ আছে , এই তথ্যের অনিবার্য অর্থ ইহাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধু তাঁহার উম্মতের নবীই ছিলেন না, তিনি সমস্ত নবীগণেরও নবী ছিলেন। ইহারই প্রতিফলন এবং বিকাশ সাধন হইবে কেয়ামতের দিন। আদম (আঃ) এবং তৎপরবর্তী সকল নবীই ঐদিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পতাকাতলে সমবেত থাকিবেন। নিম্নবর্ণিত তিরমিযী শরীফের হাদীছে তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে–

مَا مِنْ نَبِىٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلاَّ تَحْتَ لِوَائِىْ -

অর্থ ঃ "কেয়ামতের দিন আদম (আঃ) এবং তিনি ছাড়া আরও যত নবী আছেন সকলেই আমার পতাকাতলে থাকিবেন।"

পূর্বাপর সকল মানুষ, জিন ও ফেরেশতাগণের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

উল্লিখিত আয়াতের মর্ম এবং আলী (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্ব ভুবন সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষেরই নবী। কারণ, উক্ত তথ্য অনুযায়ী আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্তী প্রত্যেক নবীই স্বয়ং আল্লাহ তাআলার দরবারে অথবা ওহীর মাধ্যমে নিজ নিজ অঙ্গীকার ঘোষণা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নিজ নিজ উম্মত হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাহারা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ পাইলে তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবে এবং তাঁহার সমর্থন করিবে। আমরা হযরত (সঃ)-এর যুগপ্রাপ্ত লোকগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ আনুগত্য প্রকাশে ঈমান গ্রহণ করিয়া তাঁহার উম্মত হইয়াছি, আর তিনি আমাদের নবী হইয়াছেন; তদ্রূপ পূর্ববর্তী লোকগণও সেই প্রকার ঈমানের অঙ্গীকার গ্রহণ করায় তিনি তাহাদেরও নবী হইয়াছেন, যেরূপ তাহাদের নবীগণেরও তিনি নবী ছিলেন। কারণ, তাঁহারাও তাঁহার প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই সূত্রে হযরতের বাক্য– بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً "আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত তথা আমি সমগ্র মানব জাতির নবী।"

এই বাক্যে সমগ্র মানব জাতি বলিতে শুধু হযরতের যুগের মানুষ উদ্দেশ করার কোনই প্রয়োজন নাই; বস্তুতঃ এই সীমাবদ্ধতা উল্লিখিত বাক্যের শব্দাবলীর অর্থের ব্যাপকতার বিপরীত। পূর্বালোচিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রকৃতই পূর্বাপর সমগ্র মানব জাতির নবী।

শুধু তাহাই নহে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সমগ্র জিন জাতিরও নবী; পবিত্র কোরআনে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এই বিষয়টি বর্ণিত রহিয়াছে। (মেশকাত, পৃষ্ঠা-৫১৫) এতদ্ভিন্ন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ফেরেশতাদেরও নবী।

এই তথ্য মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছের বাক্য وارسلت الى الخلق كافة "আমি সমগ্র সৃষ্টির নবী"। সৃষ্টি শব্দের ব্যাপকতা উক্ত সত্যের ইঙ্গিত দানে যথার্থই বটে।

নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

এই পর্যন্ত যে সকল তথ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, সমস্ত সৃষ্টির সেরা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ); এমনকি সকল নবীগণেরও সেরা ও প্রধান ছিলেন তিনি। হযরত (সঃ) নিজ উম্মতকে তাহাদের নবীর মর্তবা-মর্যাদা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশে স্বীয় পরিচয় দানে এই শ্রেণীর অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা-

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ وَاَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ ـ

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সকল আদম সন্তানের সর্দার; ইহার সুস্পষ্ট বিকাশ হইবে কেয়ামতের দিন। আমি সর্বপ্রথম কবর হইতে পুনরুজ্জীবিত হইব, আমি আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হইব এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হইবে।" (মুসলিম শরীফ)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ لَّا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ ـ

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দ্বারে আসিয়া তাহা খুলিতে বলিব। তখন প্রহরী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি কে? আমি বলিব, মুহাম্মদ। প্রহরী বলিবে, আপনার সম্পর্কে আমি আদিষ্ট যে, আপনার পূর্বে কাহারও জন্য আমি যেন বেহেশতের দরজা না খুলি।" (মুসলিম)

হাদীছ ঃ জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ ـ

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সমস্ত রসূলগণের সর্দার; আমি গর্ব করি না। আমি সমস্ত নবীগণের সর্বশেষ নবী; আমি গর্ব করি না। আমি আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী;

আমারই সুপারিশ সর্বপ্রথম গৃহীত হইবে; আমি গর্ব করি না।" (মেশকাত শরীফ- ৬১৩)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا وَاَنَا مُسْتَشْفَعُهُمْ اِذَا حُبِسُوْا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّيْ -

অর্থ ঃ "রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, সকল মানুষের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম পুরুজ্জীবিত হইয়া উঠিব, আমিই সকল মানুষের প্রধান ও পরিচালক হইব- যখন সকলে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হইবে। আল্লাহর মহান দরবারে যখন সকলেই নির্বাক থকিবে তখনও আমি সকলের পক্ষ হইতে কথা বলিব। সকলে যখন হাশরের ময়দানে অস্বস্তিকর অবস্থায় আবদ্ধ থাকিবে তখন তাহাদের পক্ষে আমারই সুপারিশ গৃহীত হইবে। সকলে যখন নিরাশ অবস্থায় থাকিবে তখন আমিই সকলকে আশার বাণী শুনাইব। ঐ দিন সকল সম্মান আমারই হইবে, বরং সব কিছুর চাবি আমারই হাতে হইবে। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমিই সর্বাধিক সম্মানিত হইব।"

(মেশকাত শরীফ, ৫১৪)

হাদীছ ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ -

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই সত্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে যে, আমি সকল নবীগণের ইমাম বা প্রধান এবং তাঁহাদের মুখপাত্র, তাঁহাদের পক্ষ হইতে সুপারিশকারী; ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই।" (তিরমিযী শরীফ)

মে'রাজ শরীফের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে যখন বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের সমাবেশ হইয়াছিল এবং নামাযের জামাত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন আল্লাহ তাআলার আদেশে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ঐ বিশিষ্ট নবীগণের নামাযের ইমাম হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ছিল এবং কেয়ামতের দিন অসংখ্য ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ঘটিবে।

হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ لِى الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ لَايَنَالُهَا اِلَّا رَجُلٌ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ -

অর্থ ঃ "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'ওয়াসিলা' লাভের দোয়া করিও। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, 'ওয়াসিলা' কি জিনিস? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, বেশেতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত মহল; যাহা শুধু এক ব্যক্তির জন্যই তৈয়ার হইয়াছে; আশা করি একমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি।"

(তিরমিযী শরীফ)

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে হযরতের বয়ান

আমাদের আসমানী কিতাব কোরআন শরীফেও পূর্ববর্তী অনেক নবীর উল্লেখ এবং বয়ান রহিয়াছে। কিন্তু সেই বয়ান হইল সাধারণ ও স্বাভাবিক; অর্থাৎ অতীতকালের ইতিহাস স্বরূপ দৃষ্টান্তমূলকভাবে, বিভিন্ন নবীর আগমন হইয়াছে তাহার প্রমাণ ও সংবাদদানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা ভিন্নরূপ।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ধরাধামে আবির্ভাবের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার ভবিষ্যত আবির্ভাব আগমনের সংবাদ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সমগ্র সৃষ্টিকে প্রদান করা হইতেছিল। নিখিল বিশ্বকে বিশ্বপতির তরফ হইতে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি তখন হইতে আকৃষ্ট করা হইতেছিল। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া যেন কৌতূহল, অপেক্ষা ও আবেগ জাগিয়া থাকে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি; যেন নিখিলের ধ্যানের ছবি হইয়া থাকেন তিনি। তাই তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল কেতাবে তাঁহার গুণগান ও শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইতেছিল। এইসব কিতাবে তাঁহার বর্ণনা এতই বিস্তারিত ও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল যে, এই সব কিতাবধারীরা তাহাদের ধ্যানের ছবিকে ঠাহর করিতে মোটেই কোন বেগ পায় নাই। পবিত্র কোরআন দুই জায়গায় বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآئَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহাদিগকে আমি আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বশেষ নবীরূপে স্পষ্টভাবে চিনিয়া থাকে– যেমন পিতা তাহার সন্তানকে চিনিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের আলেম শ্রেণী সত্যকে গোপন করিয়া রাখে জানিয়া বুঝিয়া।" (পারা–২, রুকু–১)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآئَهُمْ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "যাহাদিগকে আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে সর্বশেষ নবীরূপে সুস্পষ্টভাবে চিনে; যেরূপে নিজ সন্তানকে চিনিয়া থাকে। যাহারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে তাহারাই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।" (পারা–৭, রুকু– ৮)

ইহুদীদের বিশিষ্ট আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং নাসারাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)– এই শ্রেণীর কতিপয় কিতাবধারী লোক হযরত (সঃ) সম্পর্কে তাঁহাদের কিতাবে বর্ণিত নিদর্শনসমূহ পরীক্ষা করিয়াই হযরতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। তদ্রূপ ইহুদী মতের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম কা'বুল আহ্বার– তিনি ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তওরাত কিতাবের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না বিধায় হযরতের সময়ে ইসলাম হইতে দূরে ছিলেন; পরে তওরাতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেমতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ مَكْتُوْبٌ فِى التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থ ঃ "তিনি বলিয়াছেন, তওরাত কিতাবে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের গুণাগুণ এবং বিবরণ লিখিত ছিল।" (মেশকাত শরীফ–৫১৫)

কা'বুল আহ্বার (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে–

يَحْكِىْ عَنِ التَّوْرَةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوْبًا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ عَبْدِى الْمُخْتَارُ لَافَظٌّ وَلَا غَلِيْظٌ ..... مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ هِجْرَتُهٗ بِطَيْبَةَ -

অর্থ ঃ "কা'বুল আহবার (রঃ) তওরাত কিতাব হইতে বর্ণনা দানপূর্বক বলিয়াছেন, আমরা সেই কিতাবে লিখিত পাইয়াছি– মুহাম্মদ, যিনি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা (তিনি কোমল স্বভাবের হইবেন)– পাষাণ হইবেন না কঠোর হইবেন না (অতিশয় শালীন ও ভদ্র হইবেন), হাট-বাজারেও চীৎকার করিয়া কথা বলিবেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধে মন্দ করিবেন না, ক্ষমা করায় অভ্যস্ত হইবেন। তাঁহার জন্ম হইবে মক্কায়, দেশ-ত্যাগ করতঃ "তায়বা" তথা মদীনায় বসবাসকারী হইবেন। (মেশকাত– ৫১৪)

পরবর্তীকালে ইহুদী-নাসারাগণ তওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবের বহু সত্য গোপন করিয়া ফেলিয়াছে এবং নানাভাবে বিকৃত করিয়া মৌলিকত্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এমনকি প্রকৃত তওরাত-ইঞ্জীল কিতাব বিশ্বে কোথাও নাই: আসল কিতাব এইরূপে উধাও করিয়া তাহার বিকৃতরূপের নামমাত্র অনুবাদকে খৃস্টানরা "বাইবেল" নামে খাড়া করিয়াছে। প্রথমতঃ তাহা যে তওরাত ইঞ্জীলের অনুবাদ তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং তাহা যাচাইয়েরও কোন উপায় নাই। আসল কিতাব একেবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বাইবেলেরও পুরাতন প্রকাশ ও নতুন প্রকাশের মধ্যে গরমিলের ইয়ত্তা নাই।

প্রতীক্ষিত রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রদর্শনীর জন্যই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে বিশ্ব প্রকৃতিকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ করিয়া রাখার জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যেন তাঁহার শুভাগমন অবিদিত না থাকে, সারা বিশ্ব তাকাইয়া থাকে তাঁহার আবির্ভাব পানে; ফলে পুলকিত হইয়া উঠিবে সারা বিশ্ব তাঁহাকে পাইয়া আপন বুকে, প্রাণ ভরিয়া উঠিবে মহাতৃপ্তিতে নিখিল সৃষ্টির এবং আনন্দ ধ্বনিতে খোশ আমদেদ জানাইবে কুল্ মখলুকাত তাঁহার শুভাগমনকে।

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন–

اَنَا دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى -

অর্থ ঃ "আমি আমার বংশ-পিতা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর দোয়ার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এবং ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ভবিষ্যত সুসংবাদের বিকাশ।"

উভয় বিষয়ই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে। হযরতর ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া নিম্নরূপ–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (রাঃ) উভয়েই পবিত্র কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণ সমাপ্ত করার শুভলগ্নে সুদীর্ঘ দোয়া করিয়াছিলেন। উক্ত দোয়ায় উল্লেখ ছিল– "হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার ফর্মাবরদার অনুগত দাস বানাইয়া রাখিও এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার অনুগত দাসের অন্ততঃ একটি দল সর্বদা কায়েম রাখিও। প্রভু হে! আর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই তাহাদের হেদায়াত উদ্দেশে একজন রসূল পাঠাইও, যিনি তাহাদেরকে তোমার কিতাব পড়িয়া শুনাইবেন, কিতাবের শিক্ষাদান ও পরিপক্ব জ্ঞান তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদিগকে সর্ববিষয়ে পবিত্র ও পরিমার্জিত করিবেন।" (পারা–১, রুকু–১৫)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্মিলিতভাবে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বে এই দোয়া করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হাদীছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দোয়ার শেষ অংশটিই উদ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত দোয়ায় যে রসূল আগমনের জন্য আল্লাহর দরবারে আবেদন করা হইয়াছিল সেই রসূলই আমি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের বহু পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা বিশ্ব মুরব্বী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন; যেন তাঁহার প্রতি নিখিলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এস্থলে একটি প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, উক্ত দোয়াকারী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের পর হইতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বহু নবীর আগমন হইয়াছে, এমতাবস্থায় অন্য কোন নবী উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন না, অথচ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল পরে আবির্ভূত একমাত্র মুহাম্মদ (সঃ) ঐ দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন– ইহার সূত্র কি? উত্তর এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র (১) ইসহাক (আঃ) (২) ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হইতে তাঁহার পরবর্তী নবীগণের আগমন হইয়াছে। ইসহাক (আঃ) হইতে বংশ পরম্পরায় বহু সংখ্যক নবীর আগমন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বনী-ইসরাঈলের নবী ছিলেন। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশ হইতে দীর্ঘ তিন সহস্রাধিক বৎসর পরে শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন হইয়াছিল। উল্লিখিত দোয়ার মধ্যে আমাদের বংশধর হইতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বলিতে উদ্দেশ করা হইয়াছে ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ)। কেননা তাঁহারা উভয়েই কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণে শরীক ছিলেন। পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে–

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ

পবিত্র কা'বা গৃহ পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল, তাঁহারা উভয়েই সমবেতভাবে ঐ দোয়া করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ দোয়ায় উল্লিখিত রসূলের উদ্দেশ্য একমাত্র সেই রসূলই হইতে পারেন যিনি হযরত ইব্রাহীমের বংশ হইতে হযরত ইসমাঈলের সূত্রে। এইরূপ রসূল একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। পক্ষান্তরে হযরত ইব্রাহীমের বংশের অন্য সব নবী ছিলেন হযরত ইসহাকের সূত্রে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বিষয়– আমি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ভবিষ্যত সুসংবাদের বিকাশ– এই সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে–

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ـ

অর্থ ঃ "একটি স্মরণীয় কথা– মারইয়াম পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূলরূপে আসিয়াছি– আমার পূর্ববর্তী কিতাব তওরাতের সমর্থনকারী হইয়া এবং এই সুসংবাদ

লইয়া যে, আমার পরে এক মহান রসূল আসিবেন যাঁহার নাম হইবে 'আহমদ'। (পারা–২৮, রুকু–৯)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীছে সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে – স্বয়ং নবী (সঃ) নিজের নাম 'মুহাম্মদ' এবং দ্বিতীয় নাম 'আহমদ' বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের ছয় শত বৎসর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক এই সুসংবাদপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইয়াছিল।

নিখিল সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

পূর্বালোচিত যাবতীয় তথ্যসমূহ এই সত্য সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) কুল মাখলুকাত তথা সমগ্র সৃষ্টির সেরা ছিলেন। সৃষ্টিজগতের সেরা সৃষ্টি হইল মানব জাতি; তাহাদের মধ্যে সেরা মানুষ হইলেন নবী-রসূলগণ। নবী রসূলগণের সকলের সেরা ও প্রধান হইলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)। এই বিষয়ে অনেক হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি সুদীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ ـ

অর্থ ঃ "আল্লাহ তাআলার নিকট পূর্বাপর সকল সৃষ্টির সেরা ও সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আমি; ইহা বাস্তব সত্য-গর্ব নহে।" (তিরমিযী শরীফ)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে বলিলেন, বনী ইসরাঈলগকে জানাইয়া দিবেন, যেকোন ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে এই অবস্থায় যে, সে আহমদকে স্বীকার করিয়াছিল না, তাহাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করিব সে যে-ই হউক না কেন। মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, আহমদ কে? আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে মূসা ! আমার মহত্ত্বের বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি– আমার এমন কোন সৃষ্টি নাই যে আমার নিকট তাঁহার অপেক্ষা মহান ও সম্মানিত হইতে পারে। আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টিরও (যাহার পরিমাণ বর্তমান হিসাব অনুসারে) বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে আমার নামের সহিত মিশ্রিতরূপে তাঁহার নাম আরশের গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছি। আবার আমার মহত্ত্বের বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁহার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্য সকলের জন্য বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। (নশ্‌রুত তীব–১৯২)

পূর্বে এক শিরোনামে পারা–৩, রুকু–১৬-এর আয়াত বর্ণিত হইয়াছে, পূর্বকালের প্রত্যেক নবী হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবকাল পাইলে অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন ও তাঁহার সাহায্য করিবে এবং তাঁহার অনুগত-অনুসারী হওয়ার জন্য নিজ নিজ উম্মতকে আদেশ করিবে। উক্ত পারা–৩, রুকু–১৬-এর আয়াতে বর্ণিত নবীগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল– যেরূপ সূরা আ'রাফ ১৭২ নং আয়াতে বর্ণিত মানব জাতি হইতে গৃহীত অঙ্গীকারের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বিস্মৃতি ঘটিয়াছে অথবা ওহীর মাধ্যমে সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে উল্লিখিত সতর্কবাণীর আলোচনা হইয়াছে।

মাহবুবে খোদা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৃষ্টি নহেন; মহান সৃষ্টি– অতি মহান। স্রষ্টার ছিলেন তিনি মাহবুব– প্রিয়পাত্র, একান্ত ভালবাসার বস্তু। পূর্বালোচিত

তথ্যাবলীতে এবং অনেক হাদীছে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে।

হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; একদা কিছু সংখ্যক ছাহাবী হযরতের মসজিদে দ্বীনের কথাবার্তায়) বসিয়া ছিলেন। হযরত (সঃ) গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। ঐ সময় তাঁহারা বিভিন্ন নবীর আলোচনা করিতেছিলেন– একজন বলিলেন, আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহাকে স্বীয় দোস্ত বানাইয়াছেন। অপরজন বলিলেন, মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কথা বলিয়াছেন। আর একজন বলিলেন, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার শুধু আদেশ বাক্যে সৃষ্ট এবং তাঁহার সরাসরি প্রেরিত আত্মা। অন্য একজন বলিলেন, আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা স্বীয় মনোনীত আখ্যায়িত করিয়াছেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদের প্রত্যেকের উক্তি সমর্থনপূর্বক নিজের সম্পর্কে বলিলেন, "সকলে শুনিয়া রাখ– আমি হাবীবুল্লাহ– আল্লাহ আমাকে আপন দোস্ত, প্রিয়পাত্র ও ভালবাসার পাত্র বানাইয়াছেন।" (মেশকাত শরীফ)

আমরা এই ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিব; সেইটি হইল, আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের ফযীলত ও মর্তবা। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে, তিনি আল্লাহ তাআলার কিরূপ ভালবাসার পাত্র যে, আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি দরূদের এত অধিক মূল্য দিয়া থাকেন।

হযরতের প্রতি দরূদের ফযীলত

পবিত্র কোরআনের আয়াত–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা সম্প্রদায় প্রিয়নবীকে দরূদের সওগাত প্রদান করিয়া থাকেন; হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ কর।" (পারা– ২২, রুকু– ৪)

হাদীছ ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করিবেন, তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিবেন এবং দশটি মর্তবা বাড়াইবেন। (নাসায়ী শরীফ)

হাদীছ ঃ আবু তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিব্রীল (আঃ) বিশেষভাবে এই কথাটি বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, যেব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আমি তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করিব। যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি সালাম পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার সালাম (শান্তি) পাঠাইব। (নাসায়ী শরীফ)

একবার দরূদ পাঠে দশটি রহমত লাভ হওয়া ন্যূনতম প্রতিদান; ইহা অপেক্ষা বেশী রহমত লাভের সুসংবাদও রহিয়াছে।

হাদীছ ঃ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে সত্তরটি রহমত দান করিবেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার জন্য সত্তরবার মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। (মেশকাত শরীফ; পৃঃ–৭৮৭

হাদীছ ঃ উবাই (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দোয়া-কালাম পড়ার নির্ধারিত সময়ের কি পরিমাণ অংশে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, তুমিই নিজ ইচ্ছায় নির্ধারিত কর। আমি আরজ করিলাম, চতুর্থাংশ? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও

বেশী করিলে তোমারই অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, অর্ধেক? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দুই তৃতীয়াংশ? হযরত (সঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দোয়া-কালামের সম্পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দরূদ পাঠেই কাটাইব? হযরত (সঃ) বলিলেন, তাহা করিলে (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তোমার সকল রকম চিন্তা-ভাবনা দূর করার ব্যবস্থা করা হইবে এবং গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিযী শরীফ)

হাদীছ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা আল্লাহ তাআলা এই কাজে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা সর্বদা বিশ্বব্যাপী ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। আমার কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম পাঠ করিলে তাঁহারা ঐ সালাম আমার নিকট তৎক্ষণাত পৌঁছাইয়া থাকেন। (নাসায়ী)

হাদীছ ঃ ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুলহওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে না, যে যাবত দোয়ার সহিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া না হয় (তিরমিযী শরীফ)

এতদ্ভিন্ন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার এরূপ আরও অসংখ্য ব্যবহার প্রমাণিত আছে– যাহা তাঁহার মাহবুবে খোদা হওয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

হাদীছ ঃ মালাকুল মউত তথা জান কবজের ফেরেশতা যখন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন প্রথমে তিনি হযরত (সঃ)-কে বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার জান কবজ করিতে পারি; নতুবা কবজ করিব না। ঐ সময় তথায় জিব্রাঈল (আঃ)ও উপস্থিত ছিলেন, হযরত (সঃ) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ তাআলা আপনার সাক্ষাতের আগ্রহী। (জড় দেহের বেষ্টনী মুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বরযখী জগতে চলিয়া গেলে আল্লাহর সহিত উহার সম্পর্ক অধিক নিবিড়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় হয়– উহাকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত বলা হইয়াছে।) জিব্রাঈলের কথা শুনিয়া হযরত (সঃ) মালাকুল মউতকে রূহ কবজের অনুমতি দিলেন। (নশরুত তীব ১৭৪)

হাদীছ ঃ আদম (আঃ)-এর বেহেশতে অবস্থানকালে বিবি হাওয়া (আঃ) যখন তাঁহার পরিণীতা সাব্যস্ত হইলেন এবং উভয়ের শুভ মিলনলগ্ন উপস্থিত হইল, তখন বিবি হাওয়া মহর তলব করিলেন। আদম (আঃ) আল্লাহ তাআলার দরবারে নিবেদন করিলেন, কিসের দ্বারা আমি মহর আদায় করিব? হুকুম আসিল, আমার ভালবাসার পাত্র– হাবীব মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বিশবার দরূদ পাঠ করুন। (নশরুত তীব ১০)

ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী
ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক হযরত (সঃ)-কে রাজকীয় সম্মান মর্যাদা প্রদান

নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহার পরম প্রিয় সৃষ্টি মুহাম্মদ (সঃ)-কে যে মান-মর্যাদা ও রাজকীয় সম্মান দান করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা ছিল অপরিসীম, ভাষায় প্রকাশে সাধ্যের উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা তাঁহার পাক কালামে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে যেসব ফরমান জারি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা সেই অপরিসীম মান-মর্যাদার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যেমন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ -

অর্থ ঃ "হে মোমেনগণ! নবীজীর সম্মুখে তাঁহার আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিও না এবং তোমরা পরস্পর যেরূপ উচ্চকণ্ঠে কথা বল, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত ঐরূপে কথা বলিও না; নতুবা আশঙ্কা আছে– সারা জীবনের কৃত নেক আমলসমূহ বেমালুম বরবাদ হইয়া যাইবে।"

(পারা—২৬, রুকু—১৩)

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল দৃষ্টে বিষয়টির আরও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। একদা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মজলিসে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) উভয়ের কোন বিতর্কে তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হইয়া গিয়াছিল। তাহা কেন্দ্র করিয়াই এই মহাসতর্কবাণীর আয়াত নাযিল হইয়াছিল। ছাহাবীগণ বলিলেন, كاد الخيران ان يهلكا "আমাদের দুই প্রধান ধ্বংসের মুখ হইতে অল্পে বাঁচিয়া গিয়াছেন।"

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ـ

অর্থ ঃ "নবীজীকে কোন প্রয়োজনে ডাকিতে হইলে তাঁহাকে ঐরূপে ডাকিবে না যেরূপ তোমরা পরস্পর একে অন্যকে ডাকিয়া থাক।" (পারা–১৮, রুকু–১৫)

অর্থাৎ নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ডাকিতে হইলে তাঁহার মান-মর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মানের সম্বোধনে ডাকিবে। প্রথমোক্ত আয়াতের সংলগ্নেই আছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

অর্থঃ "যাহারা আপনাকে আপনার কক্ষের বাহির হইতে ডাকে, নিঃসন্দেহে ঐ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই নির্বোধ-আহমক। তাহারা যদি (আপনাকে না ডাকিয়া) কক্ষদ্বারে আপনার বহিরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিত তবে তাহাদের মঙ্গল হইত।"

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

"নিশ্চয় যাহারা রসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠস্বর অনুচ্চ রাখে তাহাদের অন্তরকেই আল্লাহ তাআলা খোদা ভীতির যোগ্য পাত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন; তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (ঐ)

হযরতের আবির্ভাব

নিখিল সৃষ্টির সর্বাগ্রে যে আল্লাহ তাআলা "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া"কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন– যাহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে; সেই হাকীকতে মুহাম্মদিয়া ছিল হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র আত্মা বা তাহার জ্যোতির্বাহনসহ। এবং তাহা আলমে আরওয়াহ বা আল্লাহর কুদরতী ঊর্ধ্বজগতে চলমান ছিল আদম সৃষ্টির পূর্ব হইতে। সেই ঊর্ধ্বজগত হইতে এই জড়জগত ও বস্তুজগতে অবতীর্ণ হইবেন সেই "হাকীকতে মুহাম্মদিয়া" এবং তাহা জড় দেহের পোশাকে লৌকিক জগতে বিকশিত হইবেন– ইহাই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের অর্থ।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে দেখাইবার জন্য এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি; সেই মহানেরই প্রদর্শনী রূপে এই বিশ্বজগতের ওজুদ বা অস্তিত্ব। অতএব সেই মহানের মর্যাদানুপাতিক যোগ্য প্রদর্শনীরূপে এই বসুন্ধরার সুগঠনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সমাপ্ত হইবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাঁহারই নীতি রহিয়াছে প্রত্যেক জিনিসকে ধাপে ধাপে উন্নত মানে উন্নীত করা; এই ক্ষেত্রেও সেই নীতি

চলিয়াছে। বিশ ভুবনকে বিধাতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য যোগ্য প্রদর্শনী ক্ষেত্র (Exhibition ground) রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে। সেই গঠন কার্য সম্পাদনের জন্যই ছিল বিশ্ব বুকে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের আগমন। বিশ্ব ভুবনে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সর্বশেষ আগমনের ইহাই ছিল রহস্য। কোন মহামূল্যবান ও মর্যাদাবান বস্তুর প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এইরূপই হইয়া থাকে; প্রথমে উক্ত প্রদর্শনী ক্ষেত্রকে সেই মহামূল্যবান বস্ত প্রদর্শনীর যোগ্য করার প্রচেষ্টায় শত শত শিল্পীর আগমন হয়; বিভিন্ন শিল্পী প্রদর্শনী ক্ষেত্রকে গড়িয়া তোলেন মূল দর্শনীয় বস্তুর মর্যাদা অনুপাতে। সেই গড়ার কার্য সমাপ্ত হইলে উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিতি হয় সেই প্রদর্শনীয় মহানের এবং প্রদর্শন শেষ হইয়া গেলে উক্ত প্রদর্শনীর বিলুপ্তির পালা আসে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন–

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ـ

অর্থ ঃ "বিশ ভুবনে আমার আগমন পর্ব শেষ হওয়ার পর কেয়ামত তথা এই বসুন্ধরার প্রলয় এতই নিকটবর্তী, যেরূপ নিকটবর্তী মধ্যাঙ্গুলি এবং তাহার সংলগ্ন আঙ্গুল।"

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব তথা বিশ্ব বুকে তাঁহার পদার্পণের জন্য মহান বিধাতা বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম কাল বা যুগের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম স্থান বা দেশের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের; বাছনি করিয়াছেন সর্বোত্তম বংশ ও ঘরের।

সর্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব

যেকোন মহামানুষের মহত্ত্বের বিকাশ ও তাঁহার মান-মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ হয় তাঁহার উচ্চ আদর্শ এবং মহৎ গুণাবলীর প্রসার, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁহার মিশনের কৃতিত্ব দ্বারা, তাঁহার সংস্কারের সাফল্যের দ্বারা। আর যে যত বড় মহান ও উত্তম সংস্কারকই হউন না কেন, তাঁহার কৃতকার্যতা নির্ভর করে তাঁহার সহকারী ও সহচর উত্তম হওয়ার উপর। সহকারী-সহচর উত্তম ও সুযোগ্য না হইলে কোন মহানের মহত্ত্বের বিকাশ এবং কোন সংস্কারকের মিশনের সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। অতএব আল্লাহ তাআলা বিশ্ব ভুবনে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং তাঁহার মিশনের সাফল্য সংস্কারের কৃতকার্যতার দ্বারা তাঁহার পূর্ণ মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার জন্য যোগ্যতম সহকারী ও সহচরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানব জাতি মানবীয় গুণাবলীতে বিশেষতঃ উত্তম সহচর এবং যোগ্য সহকর্মী হওয়ার উপাদানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যেই যুগে– ঠিক সেই যুগেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার বিকাশ ক্ষেত্র মানব সমাজে। ফলে সহজ সুলভ হইয়াছিল তাঁহার জন্য সুযোগ্য সহকারী ও সহচরবৃন্দ; শুধু কেবল তাঁহার সহকারী সহচরগণই সুযোগ্য ছিলেন না, বরং পরম্পরা দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে তাঁহার মিশনের সুযোগ্য কর্মীদের বহর। তাঁহার সঙ্গে থাকাকালে তাঁহার ভক্ত-অনুরক্ত সহকারী সহচরগণ তাঁহার জন্য এবং তাঁহার মিশনের জন্য যেভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও জান-মাল কোরবান করিয়াছেন, পূর্ববর্তী কোন যুগের কোন নবীর সহকারী সহচরগণের ইতিহাসে তাহার কোন নমুনা-নজির মোটেও দেখা যায় না। এই সত্যের দৃষ্টান্ত বদর জেহাদের ইতিহাসে দেখা যায় এবং হোদায়বিয়ার ঘটনা"র বিবরণে শত্রু পক্ষের সাক্ষ্যেও পাওয়া যায় (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। আর বদর, ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি রণাঙ্গনে তাঁহারা কার্যতঃ যে চরম উৎসর্গ ব্যাপক আকারে দেখাইয়াছিলেন, তাহার নমুনাও ইতিহাসে নাই।

তাঁহার পরে তাঁহার সহচর খলীফাগণ তাঁহার মিশনকে জীবন্তই নহে শুধু, বরং যেভাবে উন্নতির পথে আগাইয়া নিয়াছেন, তাহার নমুনাও পূর্ব যুগের কোন নবীর খলীফাদের ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজনীতির পথে ইসলামের শাসন বিস্তারের দ্বারাই নহে শুধু, বরং নবীজীর মিশন তথা দ্বীন-ইসলামের জন্য নবীজীর সহচর ছাহাবীগণ যেসব গঠনমূলক কার্যাবলী সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ভিত্তি স্থাপন

পূর্বক সম্মুখের জন্য সেলসেলা জারি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এক অতুলনীয় সোনালী ইতিহাস। যেমন–

(১) নবীর প্রধান অবলম্বন ধর্মের মূল ভিত্তি আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কিতাবের সংরক্ষণ। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে এইরূপ রক্ষণের গুণ ছিল না যে, তাহারা নিজেদের আসমানী কিতাবকে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি এই মানের ছিল না যে, তাহারা তাহাদের আসমানী কিতাবকে কণ্ঠস্থ করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। তাহাদের কিতাব শুধু কেবল পত্র-পৃষ্ঠে ছিল; ফলে তাহা শত্রু, স্বার্থান্বেষী ও ধর্মীয় মোনাফেকদের দ্বারা বৎসরে বৎসরে সংস্করণে সংস্করণে অতি সহজেই পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মূল কিতাব মূল ভাষায় বিশ্ব বুকে কোথাও বিদ্যমান নাই; আছে শুধু বিভিন্ন ভাষায় মনগড়া অনুবাদ। মূল কিতাব বিলুপ্ত হওয়ার পর অনুবাদের নির্ভরতা কি থাকিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। আর কোন ধর্মের মূল ভিত্তি আসমানী কিতাব বিলুপ্ত হইয়া গেলে সেই ধর্মের টিকিয়া থাকার অবস্থা কি হইবে তাহাও সহজে অনুমেয়।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ তথা তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতে (কেয়ামত পর্যন্ত) লোকগণ স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়ার গুণে উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছিল। ফলে পবিত্র কোরআনের ন্যায় সর্বাধিক দীর্ঘ আসমানী কিতাব এই উম্মত অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ববর্তী নবীগণের কিতাবের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ কোনকালে ছিল বলিয়া ইতিহাসে সন্ধান মিলে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যায় পরম্পরা প্রত্যেক যুগে বিদ্যমান রহিয়াছে। দেড় হাজার বৎসর পর বর্তমান যুগেও আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে; যার ফলে পবিত্র কোরআনের মুদ্রিত গ্রন্থ পরিবর্তিত হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। বিশ্ব বুকে কোরআন শরীফের সমুদয় ছাপা কপি বিলুপ্ত করিয়া দিলেও পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও বিলুপ্ত বা বিকৃত হইতে পারিবে না; কোটি কোটি হৃদয়পট হইতে পবিত্র কোরআন মূল আকারে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এত উচ্চ মানে পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার যুগের মানুষের জন্য এত বড় সংরক্ষণ কার্য সম্ভব হইয়াছে। পূর্ববর্তী কোন যুগের নবীর উম্মতদের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই; নতুবা তাহার খোঁজ ইতিহাসে থাকিত। বরং যুগ পরম্পরা এখনও তওরাত-ইঞ্জীল কিতাবের হাফেজ পাওয়া সম্ভব হইত। কারণ এই যুগেও উক্ত কিতাবদ্বয়ের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অনুসারী হওয়ার দাবীদার ভক্ত বিদ্যমান আছে এবং কোটি কোটি টাকা তাহারা ধর্ম প্রচারে ব্যয় করিতেছে। অথচ তাহাদের কিতাবের কোন একজন হাফেজ কোথাও দেখা যায় না। ইহার কারণ ইহাই যে, পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণ এই মানের ছিলই না যে, তাহারা এই কার্য সমাধা করিতে পারে। অতএব প্রথম হইতে যাহা হয় নাই পরেও তাহার সেলসেলা রহে নাই। এমনকি শেষ পর্যায়ে ত তাহার মূল কিতাবই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন আর তাহা কণ্ঠস্থকরণ সম্ভবই থাকে নাই। আর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগে তাহা যেরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল; যুগপরম্পরা তাহার সেলসেলা চলিয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

(২) তদ্রূপ পবিত্র কোরআনের অগণিত আয়াতের স্বয়ং নবীজী (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসমূহ তফসীর আকারে ছাহাবীগণ পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অতি বড় একটি গঠনমূলক কাজ ছিল। কারণ, দ্বীন-ইসলামের মূল বস্তু হইল কোরআন শরীফ যাহা মহান আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালামের প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যাখ্যা আল্লাহর প্রতিনিধি রসূলের দ্বারা হইলেই পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মূল ভিত্তি হইবে ঐ ব্যাখ্যা' সুতরাং ঐ ব্যাখ্যাবলীর সংরক্ষণ দ্বীন-ইসলামের জন্য এক অপরিহার্য বস্তু ছিল। ছাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ঐ ব্যাখ্যা সংরক্ষণের প্রতি তেমন মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কারণ, স্বয়ং ব্যাখ্যাকার রসূল তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান ছিলেন। পরবর্তী যুগ পরম্পরা তথা কেয়ামত পর্যন্ত লোকদের সম্মুখে রসূল (সঃ) থাকিবেন না, কিন্তু ইসলাম এবং কোরআন

থাকিবে; কাজেই লোকদের জন্য উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। সেই যুগ-যুগান্তরের জন্য ছাহাবীগণ পবিত্র কোরআনের উক্ত ব্যাখ্যাসমূহের সুসংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন– যাহা একমাত্র তাঁহাদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব ছিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যাখ্যাসমূহ সযত্নে সুরক্ষিত করিয়া না গেলে চিরতরে ইসলাম-জগত ঐ ব্যাখ্যার ন্যায় অপরিহার্য বস্তু হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া যাইত। যেমন যবুর, তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি আসমানী কিতাবসমূহের কোন ব্যাখ্যাই উক্ত কিতাবসমূহের বাহক নবী হইতে আজ ভূ পৃষ্ঠে বিদ্যমান নাই। অথচ তওরাতের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদী জাতি এবং ইঞ্জীলের অনুসারী হইবার দাবীদার খৃষ্টান জাতি দুনিয়াতে কত জাঁকজমকের সহিত বিরাজমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত নবীগণের সহকারী ও সহচরদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করার দূরদর্শিতা ছিল না, তাহাদের মধ্যে সেই গুণেরও অভাব ছিল ফলে তাহাদের দ্বারা উক্ত সংরক্ষণ কাজ হয় নাই; পরিণামে সেই নবীগণের পরবর্তী উম্মতগণ তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং বিশ্ব বুক হইতে তাহার চিহ্ন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহকারী সহচরগণের মধ্যে ঐরূপ গঠনমূলক এবং সংরক্ষণ কার্যের বিশেষ গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা নবীজী হইতে প্রাপ্ত আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যাসমূহ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যার ফলে আজ সেই সব ব্যাখ্যা বিদ্যমান। হাদীছ ভাণ্ডারের অধিকাংশ কিতাবে 'তফসীর অধ্যায়' নামে ঐ তফসীরসমূহ বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন ঐ শ্রেণীর তফসীরের ভিত্তিতে রচিত বিশেষ বিশেষ বড় বড় বহু তফসীর গ্রন্থও বিদ্যমান আছে। যথা– তফসীর ইবনে আব্বাস, তফসীর ইবনে জরীর, তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীর দোররে মনসুর ইত্যাদি।

(৩) পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের তুলনায় হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের লোকদের গঠনমূলক কাজের গুণ ও যোগ্যতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বীয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ইত্যাদি সমুদয় বিষয় সংরক্ষণ করা। এই জিনিসটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীনের উপর চলিতে হইলে সেই পথের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দিশারী হইবে ঐসব জিনিস। তাহা ব্যতিরেকে নবীর দ্বীন তাঁহার পরে সুষ্ঠুরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ববর্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে উক্ত গঠনমূলক অপরিহার্য কার্যের গুণ ও যোগ্যতা ছিল না বিধায় পূর্ববর্তী কোন নবীর হাদীছ ভাণ্ডার কোথাও বিদ্যমান নাই। 'হাদীছ' বলা হয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ও তাঁহার মৌন সমর্থন ইত্যাদিকে। পূর্ববর্তী কোন নবীরই এই সমস্ত জিনিস সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় নাই। যদি হইয়া থাকিত তবে পূর্ববর্তী যে সমস্ত নবীর অনুসারী হওয়ার দাবীদার আজও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ রহিয়াছে। অন্ততঃ তাহারা তাহাদের নবীর হাদীছকে প্রমাণরূপে পেশ করিতে সক্ষম হইত– যেরূপ দেড় হাজার বৎসর পরেও সক্ষম আছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতগণ এবং ইন্‌শা আল্লাহু তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত সক্ষম থাকিবে।

এই গুণ ও যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে লোকদের এতই অধিক ছিল যে, তাঁহারা নিজ নবীর আদর্শ, নীতি, কাজ, কথা, সমর্থন এবং প্রতিটি গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুসংরক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা আজ দেড় হাজার বৎসর পরেও হাজার হাজার হাদীছরূপে সাক্ষ্যসূত্র তথা সনদের সহিত শত শত কিতাব আকারে সারা বিশ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাকে হাদীছ-শাস্ত্র বা হাদীছ ভাণ্ডার বলা হয়। এই সুসংরক্ষিত হাদীছ ভাণ্ডার যাহা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতগণ সংরক্ষ করিতে সক্ষম হইয়াছে– পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মত ঐরূপ করিতে পারে নাই; তৎকালীন মানুষের মধ্যে এই প্রতিভা ছিলই না; মানবীয় গুণাবলীর উন্নতির ধাপে ধাপে মানুষ এই শ্রেণীর প্রতিভা লাভ করিয়াছে।

(৪) দুনিয়া পরিবর্তনশীল, নিত্যনূতন হইবার ঘটনাবলী ও প্রয়োজনাদি। ইসলামের নিয়ন্ত্রণ মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ও প্রতি কার্যের উপর। পবিত্র কোরআন শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারের বস্তু;

হাদীছ তদপেক্ষা বিস্তারিত বটে, কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের ঘটনা প্রবাহের খুঁটিনাটি সব বিষয়ের ফয়সালা হাদীছ সরাসরি পাওয়ার সম্ভাবনাও অস্বাভাবিক। হাঁ, উক্ত প্রয়োজন মিটাইবার এবং তাহার সমাধানের একটি পথ আছে যে, নিত্যনৈমিত্তি খুচরা ঘটনাবলী সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কোরআন ও হাদীছের আলোকে সাব্যস্ত করা; ইহাকে 'ইজ্‌তেহাদ' বলা হয়। এই ইজ্‌তীহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতেই দেখা গিয়াছে, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতে ঐরূপ প্রতিভা ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতে এমন এমন দূরদর্শী প্রতিভাধারী ইমাম– অসাধারণ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা শুধু নিজ নিজ সম্মুখস্থই নহে, বরং ভবিষ্যতের যত রকম ঘটনার জন্ম হইতে পারে, এইরূপ লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য খুচরা ঘটনাবলী গবেষণার মাধ্যমে অগ্রিম আবিষ্কার করিয়া ঐসব সম্পর্কীয় আদেশ-নিষেধ কোরআন হাদীছের আলোকে সাব্যস্ত করতঃ বিরাট গ্রন্থমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার সংখ্যা কয়েক হাজারেরও অধিক হইবে; ইহাকেই ফেকাহ শাস্ত্র বলা হয়। এইরূপ অগ্রিম আবিষ্কারের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কারণ, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ– বিভিন্ন গুণাবলীর যুগ বটে, কিন্তু ইহজগত লয়শীল; মহাপ্রলয়ের দ্বারা তাহার সমাপ্তি ঘটিবে। মহাপ্রলয় নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে সৎ গুণাবলী ক্ষীণ হইয়া আসিবে; সেমতে ইজ্‌তিহাদের ক্ষমতাও লোপ পাইবে। ইজতীহাদের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকালে দ্বীনের প্রয়োজন মিটিতে পারে সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববর্তী ইমামগণকে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ ইজ্‌তেহাদ শক্তি দান করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্রিম আবিষ্কাররূপে ইজ্‌তিহাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মাসআলা রচনা করিয়া গিয়াছেন, এই পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা দেখা যায় নাই যাহার ফতওয়া তাঁহাদের কিতাবের আলোকে পাওয়া যায় নাই; আশা করা যায় ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে না।

(৫) নবী না হইয়া নবীর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার প্রতিভা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগের লোকের মধ্যে ছিল। হযরতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবময় ভূমিকা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শান্তি শৃঙ্খলার শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের উন্নতি দ্রুততর করার ক্ষেত্রে খোলাফায়ে রাশেদীন, বরং তাঁহাদের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত খলীফাগণ কৃতিত্বের যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুসলমানদের সোনালী ইতিহাসরূপে চিরবিদ্যমান থাকিবে।

খোলাফায়ে রাশেদীন হযরতের দায়িত্ব পালনে এবং তাঁহার আদর্শ বহনে যে সাফল্য অর্জন করিবেন, তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (সঃ) দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে আমার উম্মত! তোমরা সুদৃঢ় থাকিবে আমার আদর্শের উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর, যাঁহারা সত্যের প্রতীক হইবেন।"

পূর্বকালের নবীগণের উম্মতের মধ্যে এই প্রতিভা ছিল না, এমনকি স্বয়ং তাঁহাদের সহকারী আছহাবদের মধ্যেও ছিল না; তাই সে যুগে এক নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীন বাকী রাখার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে অনতিবিলম্বে অপর নবী প্রেরণের। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে খলীফাগণ ইসলামের সর্বাত্মক উন্নতি শুধু অব্যাহত রাখাই নহে, বরং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ও শিক্ষার বদৌলতে ইহাকে অধিক দ্রুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হাদীছে এই তথ্যের বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন–

كَانَتْ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ ـ

অর্থ ঃ "বনী ইস্‌রাঈলকে পরিচালনা করিতেন নবীগণ– যখনই এক নবীর তিরোধান হইত, তাঁহার স্থলে অপর নবী আসিতেন। আমার পরে আর কোন নবীর আগমন হইবে না; আমার পরে খলীফাগণ হইবেন।"
(মেশকাত শরীফ– ৩২০)

এতদ্ভিন্ন মানবীয় সাধারণ গুণাবলী– যেমন সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ব, পরোপকার, দানশীলতা, দয়া, সাহসিকতা, একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা; এমনকি প্রভু ভক্ত ইত্যাদি অসংখ্য গুণাবলী, যদ্দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে– সেইসব গুণাবলীর অধিকারীরূপে হযরতের যুগটি ছিল শীর্ষস্থানীয় যুগ। তাঁহাদের উপর কুফর বা অন্ধকারের আবরণ পড়িয়া থাকায় কোন কোন গুণের সুষ্ঠু বিকাশ হইতেছিল না বা গুণগুলি অপাত্রে অক্ষেত্রে ব্যয়িত হইতেছিল; হযরতের উসিলায় যাঁহাদের হইত সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা এমন বিশ্ব-সেরারূপে বিকশিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তুলনা পূর্ব ইতিহাসেও নাই, পরবর্তী ইতিহাসেও নাই এবং দুনিয়ার শেষ যুগ পর্যন্ত পাওয়াও যাইবে না। হযরতের ছাহাবীগণের ইতিহাস, যাহা অমুসলিমদের নিকটও স্বীকৃত, সেই ইতিহাসই উল্লিখিত দাবীর উজ্জ্বল প্রমাণ।

তাঁহাদের এইরূপ অতুনীয় উচ্চাসনে আসীন হওয়ার পক্ষে হযরতের সাহচর্যের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজস্ব গুণাবলীর প্রভাবও কম ছিল না। বীজ এবং বীজ বপনকারী যতই উত্তম হউক না কেন, জমি যদি উত্তম না হয় তবে ফল ভাল হইতে পারে না। ছাহাবীদের ন্যায় সুপাত্র ও সুক্ষেত্র দ্বারা হযরত (সঃ) এমন একটি সোনালী যুগ ও সোনালী জমাত এবং পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, যাহা বিশ্ব-জীবনের সর্বোত্তম যুগ, সর্বোত্তম জমাত ও পরিবেশ ছিল এবং সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত ছিল। তাই স্বয়ং হযরত (সঃ) ছাহাবীদের যুগের প্রসংশায় বলিয়াছেন– خير القرون قرنى "আমার সাহচর্যে গঠিত যুগটি হইল বিশ্ব জীবনের সর্বোত্তম যুগ।" তাঁহারা এতই উত্তম ছিলেন যে, হযরতের সোনালী আদর্শে প্রস্ফুটিত মহিমাকে তাঁহারা তিন যুগ পর্যন্ত চলমান রাখার ব্যবস্থায় সফল হইয়াছিলেন।

সুতরাং পরবর্তীকালে ইসলামের আদর্শ ও জীবনধারা খুঁজিতে হযরতের যুগ তথা ছাহাবীগণের ইতিহাস উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামি হইবে। হযরতের আদর্শের সঠিক খোঁজ পাইতে হইলে ছাহাবীগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিতেই হইবে। কারণ ছাহাবীগণ হযরতের শিক্ষা ও আদর্শ যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার নমুনা কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ। অর্থাৎ এই যুগের মানুষ বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বেকার যুগসমূহের মানুষ অপেক্ষা উন্নত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে কতিপয় গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণাবলী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মতের মধ্যে ছিল। কারণ, ইসলামের দীর্ঘায়ু লাভ এবং উন্নতির পথে উক্ত গুণাবলীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই মুসলমানগণ ঐসব গুণে অধিক যত্নবান ও অধিক তৎপর ছিলেন।*

বলাবাহুল্য, হযরতের যুগ সর্বোত্তম হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং সেই যুগের সর্বময় মানবগুষ্ঠি প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য। যাহাদের ভাগ্যে ইসলাম জুটে নাই, তাহারা তাহাদের প্রতিভা ও
গুণ-বৈশিষ্ট্য জাগতিক উন্নতির পথে ব্যয় করায় নিয়োজিত হইয়াছে, ফলে ধাপে ধাপে তাহারা জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কারে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, পূর্ব যুগে ঐ সবের কল্পনারও অস্তিত্ব ছিল না। উক্ত বিজ্ঞান

* ইহজগত ধাপে ধাপে প্রলয়ের দিকে আগাইয়া যাইতে থাকিবে; তাহার জন্য ধাপে ধাপে মুসলমানদের ইসলামী গুণাবলীর শিথিলতা অবধারিত। কারণ, ইসলাম বিলুপ্ত হইলেই জগতের বিলুপ্তি আসিতে পারিবে। তাই উল্লিখিত ইসলামী গুণাবলী উচ্চমান হইতে ধাপে ধাপে শিথিল হইয়া নিম্নমানের দিকে আসিয়াছে। পক্ষান্তরে মানব জাতির বিশেষ প্রতিভা ও গুণাবলীর জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কার বিভাগ– যাহার আলোচনা সম্মুখে আসিতেছে– তাহার মধ্যে শিথিলতা আসে নাই, বরং দিন দিন তাহার উন্নতি বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ, মহাপ্রলয়ের পূর্বে জগত তাহার উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া তারপর লয়ের পালায় আসিবে।

ও আবিষ্কার ঐ প্রতিভা গুণাবলীরই অবদান যাহার বদৌলতে হযরতের যুগ তথা তাঁহার যুগের মানুষকে উত্তম বলা হইয়াছে। এই বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য সকলেরই বিদিত, সকলেই ইহার উপর গর্ব করে।

সারকথা– সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে ধাপে ধাপে উন্নত করিয়াছেন। মানব জাতি যখন উপরোল্লিখিত শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণের পর্যায়ে পৌছিয়াছে– যাহা মানব জাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্তকৃত চরম উন্নতির পর্যায় ছিল, তখন বিধাতা তাঁহার হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বিশ্ব ভুবনে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের জন্য সৃষ্টিকর্তা যুগের পর যুগ বিলম্ব করিতেছিলেন এই যুগটির জন্যই– যাহা মানব জাতির প্রতিভা ও গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ। এই যুগটি আসিলে পরই আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন। এই তথ্যই নিম্নের হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

১৬৫৮। হাদীছ ঃ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِى اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ اَلَّذِىْ كُنْتُ مِنْهُ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন– মানব সমাজ যে যুগে যুগে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে (মানবীয় প্রতিভা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে) উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই উন্নতির সর্বাধিক উত্তম যুগে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে; অতপর যখন আমার আবির্ভাবের (উপযুক্ত) যুগ আসিয়াছে তখনই আমার আবির্ভাব হইয়াছে।

হযরতের জন্য দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্বাচন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইহজগতে আবির্ভূত হইবেন; সৃষ্টিকর্তা তাঁহার জন্মের জন্য বিশ্ব বুকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কা নগরীকে নির্বাচিত করিলেন।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা তাঁহার পবিত্র কালামে মক্কা নগরীকে যেসব নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন তাহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যথেষ্ট।

(১) আল্লাহ তাআলা তাহাকে ام القرى উম্মুল কোরা আখ্যা দিয়াছেন। "উম্মুল কোরা অর্থ সমস্ত নগর-নগরীর জননী। বিশ্ব বুকে যত নাগরী আছে সবের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এই নগরী তথা ইহার কা'বা শরীফকে যেরূপ আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্ব মানবের জন্য কেন্দ্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ সৃষ্টির বেলায়ও মক্কা নগরী সারা ভূমণ্ডলের কেন্দ্র ছিল। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা ভূমণ্ডল সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীর খণ্ডকেই সৃষ্টি করেন এবং পরে উহা কেন্দ্র করিয়াই ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হয়। এই সূত্রেও তাহাকে "উম্মুল কোরা" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সকল নগর-নগরীর কেন্দ্রস্থল।

(২) আল্লাহ তাআলা তাহাকে البلد الامين আল-বালাদুল আমীন বলিয়াছেন, যাহার অর্থ শান্তির নগরী। মক্কা নগরীর এই বৈশিষ্ট্য সর্বকালে সর্বযুগেই উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এই বৈশিষ্ট্যকে এত দূর সম্প্রসারিত করিয়াছেন যে, বন্য পশু-পক্ষী এবং গাছ-পালার জন্যও তাহাকে শান্তি এবং নিরাপত্তার স্থানরূপে ঘোষণা দিয়াছেন। ঐ এলাকার কোন উদ্ভিদ বা তৃণ-লতার পাতাও ছিন্ন করা নিষিদ্ধ, ঐ এলাকার কোন বন্য পশু-পক্ষীকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ।

মক্কা এলাকার এই শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্ধকার যুগের বর্বররাও শ্রদ্ধা করিত, এমনকি তাহাদের কেহ নিজ পিতার হত্যাকারীকেও এই সীমার ভিতর কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিত না।

শান্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য এই শান্তির নগরী যথোপযুক্তই ছিল। এই মক্কা নগরী আল্লাহ তাআলার নিকটও এত অধিক সম্মানী ও মর্যাদাশীল যে, ইহার হরম শরীফের মসজিদে এক রাকাত নামাযে সাধারণ মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ রাকআতের সওয়াব হইয়া থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রিয় নবীর জন্য এই প্রিয় নগরীকেই নির্বাচন করিয়াছেন।

ভৌগোলিক দিক দিয়াও মক্কা নগরীর বৈশিষ্ট্য বিচিত্রময় মক্কা নগরী ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, মক্কা নগরী যে ভূখণ্ডের বক্ষে অর্থাৎ আরব দেশে অবস্থিত, তথা হইতে যত সহজে ও অল্প সময়ে নৌ ও স্থল পথে পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগণ করা যায়, অন্য কোন দেশ হইতে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। অতএব জগতের মুক্তিদাতার আবির্ভাবের জন্য ভূমণ্ডলের এই এলাকাই সর্বাধিক সমীচীন ছিল।

হযরতের জন্য সর্বোত্তম বংশ নির্বাচন

এই সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বর্ণনা দান করিয়াছেন–

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর ইসমাঈল (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; হযরত ইসমাঈলের বংশধর কেনানা' গোত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; কেনানা গোত্রে কোরায়শ শাখাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। কোরায়শ শাখার মধ্যে হাশেমের বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে আমাকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (মেশকাত শরীফ)

হাদীছ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা নিখিল সৃষ্টির মধ্যে আদম জাতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; আদম জাতের মধ্যে আরবীদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হাশেম বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং আমাকে সেই বংশভুক্ত করিয়াছেন। (যোরকানী, ১– ৬৯)

হযরতের সময়কাল

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর একমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, তাঁহাদের মধ্যবর্তীকালে কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্তী সময়কালের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ৫৬০ বৎসর, কাহারও মতে ৫৪০ বৎসর।ঃ

(ফতহুল বারী ৭–২২২)

এই সংখ্যাকে প্রচলিত কথাবার্তায় ৬০০ বৎসর বলা নিতান্তই স্বাভাবিক। অধিক শতকের সংখ্যায় অসম্পূর্ণ শতককে শতকে পরিণত করা সাধারণ ক্ষেত্রে মোটেই দূষণীয় নহে।

ইমাম বোখারী (রঃ) এই সম্পর্কে (৫৪০ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছেন–

عَنْ سُلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيْسٰى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ ـ

অর্থঃ "ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মধ্যবর্তী সময়কাল– যে সময়ে কোন নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল না, ছয় শত বৎসর ছিল।"

ব্যাখ্যা ঃ সালমান ফারেসী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ঈসার ধর্মাবলম্বী– নাসরানী হইয়াছিলেন। তিনি সেই ধর্মের একজন বিশেষ সাধক ছিলেন এবং সেই ধর্মের অনেক বিশেষজ্ঞের শিষ্যত্ব ও সাহচর্য তাঁহার লাভ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স-মাত্রা ছিল অসাধারণ। হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লারে মদীনায় আসার পর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ৩৬ হিজরী সনে ওফাত